অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প একটি বিষেণ

প্রসূন ঘোষ

‘হাজার হাজার বছর ধরে উৎপাদনের যে - গতিটা এ সমাজ বয়ে এনেছে, ঔপনিবেশিক শাসনে তা ভেঙে পশ্চিমী মডেল ধরেছি আমরা। তাতে কারিগর, শিল্পী, পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ তৈরি হয় শিক্ষায়তনে। তাই কি এই ব্যর্থতা? তাই কি শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে আমরা এমন নিঃস্ব? আমাদের নিজস্ব মডেলের বিবর্তিত রূপের মধ্যেই কি আমাদের মুক্তি?’’ দীর্ঘ দু’শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে দেশজ পরম্পরার বিপরীতে যে ভিন্ন পরম্পরা গড়ে উঠেছে সমাজে, সেই পরাশ্রয়ী পরম্পরায় আমাদের সম্পূর্ণতা সাধিত হয়নি। ঔপনিবেশিক কালে যে সংস্কৃতিকে আমরা আয়ত্ত করতে চেয়েছি তা যেমন সার্বিক হয়নি, তেমনি তা আমাদেরপক্ষে পুরোপুরি অধিগতও হয়নি। এই কালে যে শিক্ষাকে আমরা গ্রহণ করেছি, সেই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের মনের জগতে এক বিচ্ছিন্নতারই জন্ম দিয়েছে। শহরে এসে শিক্ষাগ্রহণ ক’রে গ্রামের জীবনে শরিক হতে গিয়ে আমরা নিঃসঙ্গই হয়েছি (প্রসঙ্গত স্মরণীয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসের শশী চরিত্র)। উত্তর উপনিবেশ কালের শরিক হিসাবে আমরা দেখি আমাদের ঐতিহ্য বিনষ্ট, আমাদের দেশজ পরম্পরা মৃতপ্রায়, কিন্তু তাকে মুছে ফেলাও সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে রয়েছে পরাশ্রয়ী আর এক পরম্পরা যা দেশজ পরম্পরার সঙ্গে দুধে জলে মিশ্রিত হয়নি, তেলে জলের মতোই আলাদা হয়ে গেছে। গল্পকার অভিজিৎ সেন ‘ঋষির শ্রাদ্ধ’ গল্পেআমাদের অতীত ইতিহাসকেই, আমাদের পরম্পরাকেই এই বর্তমানে উপস্থাপিত করতে গিয়ে সেই জিজ্ঞাসাই রেখে যান। এই উচচারণ তাঁর ছোটগল্পে কেবল গল্প তৈরি করে না, ভিন্ন এক প্রতিবেদনও নির্মাণ করে। উত্তর উপনিবেশ কালের শরিক হিসাবে আমরা দেখি আমদের ঐতিহ্য বিনষ্ট, আমাদের দেশজ পরম্পরা মৃতপ্রায়, কিন্তু তাকে মুছে ফেলাও সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে রয়েছে পরাশ্রয়ী আর এক পরম্পরা যা দেশজ পরম্পরার সঙ্গে দুধে জলে মিশ্রিত হয়নি, তেলে জলের মতোই আলাদা হয়ে গেছে। গল্পকার অভিজিৎ সেন ‘ঋষির শ্রাদ্ধ’ গল্পে আমাদের অতীত ইতিহাসকেই, আমাদের পরম্পরাকেই এই বর্তমানে উপস্থাপিত করতে গিয়ে সেই জিজ্ঞাসাই রেখেযান। এই উচচারণ তাঁর ছোটগল্পে কেবল গল্প তৈরি করে না, ভিন্ন, এক প্রতিবেদনও নির্মাণ করে। উত্তর উপনিবেশকালের যাঁতাকলে উপনিবেশবাদের মূল্যবোধগুলি কেমন তছনছ হয়ে যাচ্ছে, অথচ তাকে বজায় রাখতে চাওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টাও আমাদের মধ্যে কেমন বিভ্রম তৈরি করে চলেছে অভিজিতের গল্পের বয়ানে সে সত্যটিকেই বারবার প্রত্যক্ষ করি। অভিজিতের ছোটগল্প তাই কেবল মানুষের গল্প নয়, নিজেকে চেনার গল্পও বটে। এ আমাদের নিজের কথা, আমাদের পরিসরের কথা, আমাদের শিকড়কে জানা আমাদের উৎসভূমিকে স্মরণ করার কথা। আসলে কিছু ব্যতিক্রমী রচনা বাদ দিলে এযাবৎকাল আমাদের কথাসাহিত্যে যে ধারাবাহিক প্রতিবেদন রচিত হয়েছে, তাতে ঔপনিবেশিক প্রভাব উপনিবেশকালে আধুনিকতার কেন্দ্রভূমিটি আমাদের চোখের সামনেই প্রতিনিয়ত বিনষ্ট হতে দেখেছিলাম আমরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে, মন্বন্তর তেভাগা দেশভাগ দাঙ্গা উত্তরপটে আমাদের অর্থনৈতিক সংকট যেমন তীব্র ছিল,তেমনি ষাট ও সত্তর দশকেও আমাদের স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়েছিল। সুতরাং এই নবপটভূমিই উপন্যাস বা ছোটগল্পের ভিন্ন বয়ান নির্মাণেসহায়ক হয়েছে। সত্তর দশকেই দেখা যায় কেবল রাজনীতি সচেতন লেখকেরাই নন, অপেক্ষাকৃত ঢিলেঢালা ও সস্তা মনোরঞ্জনে নিয়োজিত সাহিত্যিকেরাও সময় সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই কথাসাহিত্যের প্রতিবেদনে ধরা থাকছে নিম্নবর্ণের ম

ানুষ প্রান্তিকায়িত জনছবি, উপেক্ষিত ব্যক্তি কিংবা পরিবর্তনশীল ও পরিবর্তনে প্রয়াসী জনগণের জলছবি। আবার সময় সচেতন লেখকের লেখায় স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে সন্ত্রাস, ভায়োলেন্স, সাধারণ মানুষের সন্ত্রস্ত মানসিকতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, তথা বিষাদময় ইতিহাস কথা। যদিও প্রবল কালসচেতন কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতাদেবী আক্ষেপ প্রকাশ ক'রে বলেছেন "সত্তরের দশকে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মানসিক নির্বীর্যতা ও অন্ধকার অবক্ষয়ের চূড়ান্ত চেহারা দেখলাম। দেশ ও মানুষ যেখানে প্রত্যহ রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় দীর্ণ বিদীর্ণ হচ্ছিল, সেখানে বাংলা সাহিত্য এত বড় যন্ত্রণার শিক্ষাকে অস্বীকার করে পরীর দেশের অলীক, স্বপ্নাশ্রয়ী বাগানে মিথ্যে ফুল ফোটাবার আত্মঘাতী খেলায় ব্যস্ত হয়ে গেল। কেমন এমন হল, তার বিশ্লেষণ করল না কেউ সামগ্রিকভাবে, খুব কম লেখাই সময়ের দলিল হয়ে রইল।" (উপন্যাস ভাবনা', মহাশ্বেতা দেবী, 'এবং মুশায়েরা', জানুয়ারি ১৯৯৮) অর্থাৎ কথা সাহিত্যের প্রতিবেদনের গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যেতে চাইছেন না লেখক। আটের দশকে গ্রাম নির্ভর সমাজব্যবস্থার নানা হেরফের ঘটে যাচ্ছিল। বিশেষত জোতদার - আধিয়ার - মাহিন্দর ভাগচাষীরা তাদের নিজস্ব জমি, বর্গাজমি, খাসজমি প্রভৃতির দখল রাখতে গিয়ে বিভিন্ন সংগ্রামের মুখোমুখি যেমন হচ্ছিল, তেমনি পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার শুভ ও অশুভের দিকগুলিও এড়িয়ে ফেলা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। এই সময়েই (১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে) লাতিন আমেরিকার কথাসাহিত্যিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ নোবেল পুরস্কার পান এবং লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি লেখক পাঠকের পরিচয় ঘটে। লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে প্রতিফলিত দেশ - কাল - মানুষের সঙ্গে এবঙ্গের মানুষজন নিজেদের মেলাতেও শু করে। সাহিত্যিকরাও লাতিন আমেরিকার ম্যাজিক রিয়েলিজম বা যাদুবাস্তবতা আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। আসলে একদা উপনিবেশবাদের আগ্রাসী লেহন ক্ষমতায় দু'দেশই পীড়িত, সে পীড়নের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য দু'দেশই দীর্ঘ সময় যাবৎ সংগ্রাম করেছে। আবার উপনিবেশবাদের সর্বব্যাপী ক্রিয়ায় নিজের উৎসকে মুছে যেতে দেখে অথচ উৎসকে অস্বীকার করতে না পারার টানা পোড়েনে উত্তর উপনিবেশকালের মানুষজনের যন্ত্রণাদগ্ধ পরিস্থিতি দু'দেশেই পরিলক্ষিত। অভিজিৎ সেনের মতো ছোটগল্পকার সে কথা অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা' নিবন্ধেঃ "লাতিন আমেরিকার গল্প উপন্যাস আমাদের এই মফস্বলেও এসে পৌঁছায়। খুব আশ্চর্য হয়ে আমাদের সাহিত্যে লোকায়ত জীবন, লোককথা, কিংবদন্তী, পুরাণ ইত্যাদি বিষয় ব্যবহার এবং বাবহারের পদ্ধতির সঙ্গে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের তুলনা মনে মনে করতে শু করি।" অর্থাৎ এ যাবৎকাল প্রতিফলিত জীবনে যে ঔপনিবেশিক হিগেমনি ক্রিয়াশীল তাকে মুছে ফেলতে সজ্ঞানে সচেষ্ট হয়েছিলেন উভয়দেশের সাহিত্যিকই। 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা', 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি', 'মৃত্যুর কড়ানাড়া' কিংবা 'বারো অভিযাত্রীর কাহিনী' রচয়িতা মার্কেজ তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কালে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন 'ইউরোপীয়রা আমার বই পছন্দ করে, আমার রচনায় তারা ম্যাজিক ফ্যান্টাসি দেখতে পায় বলেই। আসলে কিন্তু আমার রচনা সে সব কিছু নয়। লাতিন আমেরিকান বাস্তবতার মানেই আমাদের নিত্যদিনের বাস্তবতা। অর্থাৎ সরল আর নিষ্পাপ চোখে বাস্তবের দিকে সোজাসুজি দেখা। ম্যাজিক রিয়ালিজম মানে আমাদের বাস্তবতার ভেতর তার অলৌকিকতা আর আশ্চর্যময়তা। ইউরোপীয়রা যতটা যুক্তিবাদী সে অর্থে আমাদের মন মানসিকতা ঠিক ততটা যুক্তিবাদী নয়। হওয়া সম্ভবও নয়। আমরাযেভাবে আমাদের বাস্তবতাকে প্রকাশ করি, ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ করি, যুক্তিবাদীদের পক্ষে সেটাকে ঠিক সেভাবে বোঝা বা উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। লাতিন আমেরিকানদের দেখে মনে হবে তারা অর্ধেক স্বপ্ন আর অর্ধেক দুর্নীতির ভেতর জীবন কাটান, সদবাস্তববাদ যাদের সহজাত ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

আজকের ইউরোপে আধুনিক সাহিত্যের ধারণা হচ্ছে বিরক্তি আর ঘৃণা, আশাভঙ্গ অযৌক্তিকতা, ধবংস, ক্ষয় আর বিষাদ বৈরাগ্য ও বিচ্ছিন্নতা। আসলে ওদের আশাবাদী হবার তেমন কোনও সুযোগও নেই, তেমনই কারণও নেই। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বরং আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। সবেমাত্র আমাদের আইডেনটিটির সম্মুখীন হয়েছি।" আর এই আইডেনটিটির সম্মুখীন হতে গিয়ে সুদূর বঙ্গের মানুষজন নানা জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয় অনবরত। বর্তমান বিভ্রান্তির মধ্য থেকে আমাদের আইডেনটিটির সন্ধান ক্ষণকালের জন্য পেলে আশ্বস্ত বোধ করি আমরা।

'ঋষির শ্রাদ্ধ' গল্পে ভীমঋষির গল্প তাই তার একার গল্প নয়, আমাদের প্রত্যেকেরই গল্প হয়ে দাঁড়ায়। ভীমঋষির সংলাপও তাই হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ। দরিদ্র ঋষিদাসদের গোষ্ঠীপতি ভীম বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক। ভীম তার হাটখোলার কারখানায় খোল, মাদল, ঢোল, ঢোলক ইত্যাদি নানান বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করে। 'আমি' মালীহার ব্যাঙ্ক শাখার ম্যানেজার। রিজিওন্যাল

ম্যানেজার সুরঞ্জন সেন দেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এবং এই সীমিত ব্যবস্থাতেও উন্নয়নের প্রচেষ্টার বিশ্বাসী। দরিদ্র ভীমগোষ্ঠীতথা ঋষিপল্লীর উন্নতিকল্পে একটি প্রকল্প তৈরি করলেন ম্যানেজার 'আমি'। সুরঞ্জন সেন সেই প্রকল্পের সঙ্গে হাউস ডেয়ারি প্রকল্প যুক্তকরলেন। প্রকল্পের টাকা বাস্তবায়িত হওয়ার আগে এবং পরে ভীম ঋষি একই বক্তব্য বারবার বলে "না স্যার ও কাজ আমাদের নয়,ওঘোষেদের কাজ। ও আমরা পারব না।" তবুও ঋষিপল্লীর ছয়জন হাউস ডেয়ারি এবং চামড়ার কাজের জন্য টাকা নিল, বাকি চারজন নিল শুধু চামড়ার কাজের জন্য। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই হাউসডেয়ারিপ্রকল্প সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, আর চামড়ার প্রকল্পও বৈষ্ণবগোষ্ঠীর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে লোকসানের কবলে পড়ল। ভীমঋষির অভিমান যে যাদের যা কাজ নয়, তারা আজ সেই কাজ করছে। ভীমের বিষন্ন সংলাপ "তখনই আপনাকে বলেছিলাম গাইপোষা ঋষিদের কাজ নয়। আপনি শুনলেন না। দু মাসে হাপশেগেল সবাই।" কিংবা তার প্রতিক্রিয়া "দাদা পর দাদা - তার দাদার আমল থেকে ভীমেরা রামকেতিলে ঢোল মৃদঙ্গ বেচছে। এরকম কাণ্ড কোনদিন হয়নি।" সুতরাং আপাত গল্পের মধ্যে আমাদের মধ্যবিত্তের পরজীবি অস্তিত্বের নিস্ফলত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। তাই ম্যানেজার 'আমি' কোন অর্থেই ব্যাংকের লোক না হওয়া সত্ত্বেও এবং সুরঞ্জন সেনের সঙ্গে সকল মানুষের উন্নয়ন প্রকল্পের সহকারী হওয়া সত্ত্বেও শহরে এসে মালীহার গ্রামের কথা ভুলে যান। তথাপি যেহেতু 'আমি' ভিন্ন ভাবনার অংশীদার আর সেই ভাবনা লেখকেরই ভাবনা আর তাআমাদের মাটি বাতাসে পশ্চিমী উন্নয়নের ফলবান না হওয়ার দিকটিকে তথা আমাদের সমাজের বন্ধ্যা ও হতশ্রী দশাটিকেই চিহ্নিত করে।

'নদীর মধ্যে শহর' গল্পটিও ভীমঋষির গল্পের মতোই 'আমি'-র অনুরূপে অভিজ্ঞানের কাহিনী। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা যে সম্পূর্ণ নয়, তা যে কেবলই ফলদায়ক হয়েছে সমাজের আধুনিক মানুষের ক্ষেত্রে তা উপলব্ধি করা যায় এই গল্প পাঠের দ্বারা। অভিজিৎ সেন কেবল গল্প বলতে বসেন নি, গল্প শেষে আমাদের বায়বীয় অস্তিত্বের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্যতাকে চোখেআঙুল দিয়ে দেখিয়েও দেন। তাই গল্প শেষে 'আমি'রবক্তব্য আর লেখকের অভিজ্ঞতা সমীকৃত হয়ে যায়। লেখকের জিজ্ঞাসায় পাঠকও উত্তর খোঁজে অবলম্বনহীন বাস্তবতার অংশীদার হয়েই। গল্পের 'আমি' এবং বিনয় একদা সহপাঠী। তাদের উভয়ের আরো সাদৃশ্য হলযে তারা উচচবর্ণের মাহিষ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিনয়ের পিতামহ উভয়ের আরো সাদৃশ্য হল যে তারা উচচবর্ণের মাহিষ্য সম্প্রদায়েরঅন্তর্ভুক্ত। বিনয়ের পিতামহ গোলোক মজুমদার তিরিশ এবং চল্লিশের দশকের জাতীয়তাবাদী আদর্শকে সামনে রেখে বহু দানধ্যানের অংশীদার হয়েছিলেন, তার এলাকায় হাসপাতালের জন্য তিনি জমিও দান করেছিলেন। পৌত্র বিনয়কে শান্তিনিকেতনেও পাঠিয়েছিলেন শিক্ষালাভের জন্য। গোলোক মজুমদারের দৌলতে বিনয়ের পিতা মন্মথ মজুমদার এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন এবং সুরা ও নারী বিলাসে জীবন অতিবাহিত করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে বিনয়ের মধ্যে পিতা এবং পিতামহের যুগপৎ প্রভাবই কার্যকর। বর্তমানে গল্পের 'আমি' জয়দেব এবং বিনয় দুই ভিন্নপ্রান্তের বাসিন্দা। সরকারি বাস্তুকারের অফিসে প্রচুর টাকা পয়সা রোজগার ক'রে শহরতলীর মধ্যে পাকাবাড়ি, আসবাব ও বিলাস সামগ্রীর মালিক। অন্য দিকে বিনয় মেথর পাড়ার মহারাণী বাঁশফোরের প্রেমিক হিসাবে স্বজন সমাজচ্যুত হয়ে ঝাড়ুদারদের ভাঙাচোরা কোয়ার্টারে বসবাসকারী একজন। বিনয়ের ভাই প্রণয় পড়েছে ডাক্তারি। এই হল এ গল্পের আপাত পাঠ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ গল্পের অন্তর্ভেদে যে বিভিন্ন পাঠ উঠে আসে তাতে দেখা যায় আমাদের অস্তিত্বের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সত্যটিকে। তাই 'আমি' আর বিনয় শুধু সমাজে প্রতিষ্ঠিত আর অন্তেবাসী থেকে যায় যা তাদের শিরায় শিরায় সেই বিচ্ছিন্নতার রক্ত প্রবাহিত হতেও দেখা যায়। তাই উচচবর্ণের মাহিষ্য হিসাবে মেনে না নিয়ে রক্ষিতা রাখলেও তার বংশগৌরব কিছু পরিমাণে রক্ষিত হত।অন্যদিকে বিনয়ের উপলব্ধি "তোমরা আমাকে অনেক আগেই ত্যাগ করেছ। আমি মেথর। আমি মল ভান্ডের পাশে বসে খেতে পারি।নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারি কুকুরকে জড়িয়ে ধরে। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া মারামারি এটা শুধু পুষরাই পারে, যেমন আমার বাপ করেছিল। কিন্তু আমি তাকে ধরে এনে মেরে রক্তাক্ত করতে পারি এবং তার পরে মদ খেয়ে দুজনে হল্লা করতে পারি। এই সমস্ত কিছুরপরে দুজনে উন্মাদের মত যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে পারি!" তাই 'আমি'কে উচচবর্ণের মাহিষ্য বর্তমানে মেথর পল্লীর বিনয়ের প্রশ্ন, একদা সহপাঠী বিনয়ে প্রশ্ন যে, কে কদর্য জীবন অতিবাহিত করছে? যে ব্যক্তি উচচবর্ণের সন্তান হয়ে মেথর নারীর আকর্ষণে সকলের ঘৃণার পাত্র হয়, শিক্ষিত ও যোগ্য হয়েও চাকরি না পেয়ে দারিদ্রের কবলে পড়ে মেথরের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার নামে বিশ পঁচিশ টাকা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করছে সে; নাকি কি কৌশলে উপরিপাওনার অর্থ রোজগ

ারের দ্বারা বাড়ি ও সম্পত্তি করেছে সে? কিন্তু বিনয়ও কি মেথর হতে পেরেছিল, বিনয়ের পক্ষে কি তা হওয়া সম্ভব? এ গল্পে তাই দুটি অংশ। প্রথম অংশে অভিজিৎ দেশজ উচচবর্ণের চেতনায় নিম্নবর্গের মানুষজন সম্পর্কে ধারণার স্বরূপকে প্র াক্ উপনিবেশপর্বে সমাজে বিভাজন দৃষ্ট ছিল, কিন্তু উপনিবেশ পর্বের আধুনিকতাও উচচবর্গের চেতনায় নিম্নবর্গকে নিজের করে নিতে পারেনি। দ্বিতীয় অংশে তিনি রূপায়িত করেন উচচবর্গের মানুষটির গর্বিত ঘোষণা --- "আমি মেথর" বাস্তবে কেমন মিথ্যা হয়ে যায়। উচচবর্গের মানুষটির ভালবাসাও মেথরের গোষ্ঠীতে ঠাঁই দেয় না। যে বিনয়কে একদা স্বজন সমাজ ত্যাগ করতে হয়েছিল, সেই বিনয় মহারাণীর সঙ্গে দরিদ্রতর ঝিপাড়াতেও একঘরে থেকে যায়। উপরন্তু পরবর্তীতে বিনয়কে মহারাণীর হসপিটাল কোয়ার্টার থেকেও চ্যুত হতে হয়। তাই বিনয়ের মৃত্যুর পরে যদিও মেথররাই শেষকৃত্য করে, 'আমি' এবং ডাক্তার ভাই প্রণয় প্রত্যক্ষদর্শী থেকেই যায়, কিন্তু পূর্ববর্তী মুহূর্ত পর্যন্ত তার নিরালম্ব অস্তিত্বের মধ্যে অ ামাদের অষ্টাবক্র সমাজের প্রতিচ্ছবিকেই আমরাপ্রত্যক্ষ করি। এই গল্পের নামকরণ 'নদীর মধ্যে শহর' তাই তাৎপর্যপূর্ণ নি ম্নর জলের স্রোতকে প্রত্যক্ষ করে কেউ, অন্যদিকে উঁচু ডাঙার ঝুপড়ির মধ্যে থেকে কেউ হৈ-হল্লাতে মেতে ওঠে। কিন্তু জলের চোরাস্রোতে ভেসে যায় বিনয়ের মতো কেউ কেউ, যাদের ঠাঁই হয় না ঝোপড়িতে বা দরদালানে। এই উচচারণ ত াই প্রতীকি হয়ে ওঠে "বিনয় যদি ব্রিজ পার হয়ে ওপারে যেত, তাহলে সে বেশি ভূখণ্ড পেত। ও পাশটা জলে তেমন ডে াবে নি; কিন্তু সে তা করল না। সে আরেকবার হতাশভাবে তার স্বজনদের দিকে তাকিয়ে এ পারের জলের ভিতর দিয়ে হঁ াটতে লাগল।"

এর পাশাপাশি 'শিশুপাল' -এর মতো গল্প পাঠ করলে সমাজের নানা স্তরের শাসন শোষণের চিত্রকে প্রত্যক্ষ করা যায়। আশি - নববইয়ের দশকে অপারেশণ বর্গার মাধ্যমে এবং গ্রামীণ সমাজে নানা উন্নয়ন প্রকল্প সংযুক্ত হওয়ার ফলে প্রতিকা য়িত কৃষকদের নিজস্ব দাবি স্বীকৃত হল। কিন্তু আপাত উন্নয়নের মধ্যে ও নানা ক্ষমতা ও দাপটের টানাপোড়েন থেকেই য ায়, সময় বদলালেও তাই অবস্থায় বিশেষ বদল হয় না ভূমি নির্ভর কৃষকদের নানান সমস্যা--- তাদের শোষণের বহুমা ত্রিক চিত্র জমির হাতবদলের কাহিনি, রাজনৈতিক কর্মীর আদর্শহীনতা ও ভণ্ডামি অভিজিতের রচনায় বারবার উঠে এসেছে। উত্তরবঙ্গের গ্রাম বাংলার সঙ্গে পরিচিত লেখক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাংককর্মী চরিত্রের মধ্য দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থায় নানা সুফল ও কুফলকে উপস্থাপিত করেন। তাঁর এই সমস্ত গল্প আমাদের বর্তমান লহমার প্রতিটি স্পন্দন আমাদের অন্তর্লোকে উদভাসিত হয়ে যায়। তাঁর গল্পের কুশীলবরা কেবল ব্যক্তিচরিত্রের অংশীদার একরৈখিকবক্তব্যের ধারক হিস াবে সীমাবদ্ধ থাকে না, তারা হয়ে ওঠে বিশেষ কাল ও প্রজন্মের প্রতীক। 'শিশুপাল' গল্পের ঢিলা মণ্ডল ইতিহাসের বাহন হয়ে ওঠে। সে আজ বেদনায় দীর্ঘ নিশ্বাসকে সম্বল ক'রে বেঁচে রয়েছে। তার সেই পরিণতির অন্তরালটিকে চিনে নেওয়া য ায়,দেখা যায় তার নেপথ্যে রয়েছে সমাজের বহু স্তরের শোষণ, চাতুর্য, ক্ষমতা, দাপট, আধিপত্যের অবয়বকে। গল্পের প্র ারম্ভেই নিবন্ধকারের মতো অভিজিৎ দেউনিয়া শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেন। ঢিলা একসময় গ্রামের এবং থানার সেই রকমই একজন দেউনিয়া ছিল। তখন ঢিলার কাছে কেবলমাত্র সৎ মানুষরাই আসত। কিন্তু সে দিনের অবসান ঘটেছে। বর্তমানে দেউনিয়া শব্দের অর্থের রূপান্তর ঘটেছে। বর্তমানে দেউনিয়া ক্ষমতাশালী দানী সিংহরায় স্বার্থশূন্য সামাজিক দায়িত্ব প ালন করে না, তার কাছে সৎ - অসৎ নানা ধরনের মানুষ ভিড় করে। ঢিলা মণ্ডল একদা রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে শরিক ছিলেন, তেভাগার সময় থেকে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে একত্রে সংগ্রাম করেছে। অর্থাৎ গল্পের প্রারম্ভেই প্রাক্তন ও বর্তমান দেউনিয়ার স্বরূপ, ঢিলা মণ্ডল ও দানী সিংহ রায়ের মনোভঙ্গিগত বৈসাদৃশ্য তথা সমাজ অর্থনীতিগত বৈষম্যকে উপস্থা পিত করেন। অভিজিত গল্পের গতানুগতিক সীমারেখাও মেনে চলেন না। জীবনের অর্থবহ পরিস্থিতিকে, সুতীক্ষ্ণ সুতীব্র মুহূর্তগুলিকে ইঙ্গিতে নিহিতার্থে উন্মোচনেই তাঁর লক্ষ্য সীমাবদ্ধ থাকে না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই লেখক মন্থর লয়ে ঘটনার বিস্তারের মধ্য দিয়ে সময়ের বিবর্তন রেখাটিকে স্পষ্ট ক'রে তোলেন। ন্যারেশনের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের দেশজ গল্প বলার ধরন অর্থাৎ কথকতা ধর্মিতাকেই প্রাধান্য দেন এবং সেই কথকতাতেও একধরনের আপাত কৌতুক বজ ায় রেখেছেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দানী সিংহরায়ের মতো মানুষজনের ক্রিয়াকলাপ উত্তরোত্তর বেড়ে ওঠে--- ঢিল াকে বিষণ্ণ ক'রে তোলে। কিন্তু লেখকের কথনে আপাত কৌতুক "ষাটের দশকের শু থেকেই ঢিলা মণ্ডলের অনেক কিছু অ ালুনি লাগতে সু করে, কেমন যেন সবকিছুতে নুন কম লাগতে থাকে। কি মুখের খাবারে, কি মুখের কথায়। সমাজে কিম্বা র াজনীতিতে, সবজায়গাতেই নুনের বড় অভাব। শেষে ঢিলাভেবেছিল নুনের পরিমান হয়ত ঠিক আছে, কমে গেছে নুনের

ধক। সে জন্যই এমন লাগে। তাই সে আস্তে আস্তে সরে আসে।" প্রথাগত শিক্ষার স্পর্শহীন অথচ বাস্তব সমাজ সম্পর্কে গভীরভাবে অভিজ্ঞ মানুষটির অনুভূতির কথা সমসময়ের অংশীধার মানুষকে শাণিত জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। গ্রামের মানুষের ভূমি ও তার সংস্কার জনিত টানাপোড়েন, জমির উচ্ছেদ ও জমির দখল সংক্রান্ত নানা জটিলতার বৃত্তান্ত অভিজিৎ শিক্ষিত শহরবাসী পাঠকের কাছে হাজির করেন। আইন ব্যবস্থার নানা ধারা উপধারার প্রসঙ্গ, মালিক মহাজন উকিল মোক্তারের সহস্র ছিদ্র বের করার প্রচেষ্টার দিক, যা ভূমিসংস্কারের জটিলতার বিষয় এবং মানুষের অসহায়তার চিত্রও তাই উপস্থাপিত হয় তাঁর গল্পে। আর তখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমাদের পুঁথিসর্বস্ব আওড়ানো বিদ্যা, ভেঙে য ায় তাত্ত্বিকজগতের কুহেলি ভারাক্রান্ত যবনিকা, বোঝা যায় ক্ষমতার দাপটের চোরাস্রোতকে। ভূমিসংস্কার আইন জটিল হয়, মানুষ নিপায় হয়, দেউনিয়া দানীর কাছে অসহায় মানুষ ছুটে আসে। দানীর কাছে মানুষ হল মক্কেল, তার দুর্গের মতো নতুন দোতালা বাড়ি উঠে, তার কাঠের বাক্সের মাপ বড় হয়, বসার স্থানে তালপাতা চাটাইয়ের বদলে শতরঞ্চি ও তোষকের গদি আসে। সাধারণ মানুষ দেখে রক্তবীজ শিশুপাল দানীর রক্ত খাওয়াকে, দেখে বেড়ার ফসল খাওয়াকে। এ গল্পের নামকরণ থেকে শু করে জনতার সংলাপে কিংবা দানীর রথ প্রসঙ্গ উত্থাপনে মহাভারত থেকে মিথ প্রয়োগ করেন গল্পকার। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পর যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে ভীম ও অর্জুন--- দুই ভাই সেই রাজ্য পরিদর্শনে গিয়ে যে ভিন্ন চিত্রকে দেখেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল বেড়ার আবাদ খাওয়ার দৃশ্য। বিস্ময় চকিত দৃষ্টিতে তা দেখার পর হতভম্ব অর্জুন ফিরে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলে দিব্যদৃষ্টির অধিকারী যুধিষ্ঠির পরবর্তী যুগের প্রতীকি হিসাব এ ঘটনার বিশ্লেষণ করেন। অভিজিতের বিশ্লেষণে উঠে আসে এমনতর ঘটনাধারাই যাতে ঢিলার মতো মানুষ ক্রমে নিঃসঙ্গ হয়, নিষ্ক্রিয় হয়। ঢিলা হত াশভাবে দেখে দানী রাজনৈতিক দলের নাম ভাঙিয়ে সাধারণ মানুষের মাথায় আঘাত করে, ভানা বর্মনের মতো মানুষ কেবলমাত্র ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অংশীদার নয় বলে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হয়। গল্পকার অভিজিৎ দানী কিংবা ঢিল ার ভাবনায় তাঁর স্বরন্যাসকে উত্থাপন করেন। বর্তমান সময়ের কুশীলবদের সামনে কোন অবলম্বন নেই, কোন আদর্শ নেই, জীবনের তাই নেই কোন সার্থকতাও। দিব্যদৃষ্টিতে দেউনিয়া দানী সিংহরায় তাই দেখতে পায় "রাম শ্যামকে ঠকায়, আব ার যদুর কাছে ঠকে রাম। শুধু বেঁচে থাকার ধান্দায় রাম, শ্যাম, যদু পরস্পরকে ঠকিয়ে যাবে, অথবা ঠকাবার চেষ্টা করবে। চোখের সামনে উচচতর কোন লক্ষ্য নেই। এ যেন রিক্সাওয়ালাদের সন্ধ্যাবেলায় সেই একই রোজগার একের কাছ থেকে অন্যের কেড়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা!" ক্ষমতার বদল হলেও শোষণের বদল হয় না, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রযুক্ত চরণ --- "রাজা আসে যায়/ রাজা বদলায়... দিন বদলায় না।"

তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে অভিজিতের উচচারণের মধ্যেও "ঢিলে মণ্ডল একটা নতুন জিনিস বোঝে। ব্লক অফিস, পঞ্চায়েত, ল্যাণ্ড রিফর্ম, আদিবাসী অফিস, সমবায় সমিতি, ব্যাংক ইত্যাদি যাবতীয় অফিসের মাধ্যমে বন্যার জলের মত সরকারি ট াকা আসছে গরিব মানুষের নামে। আর টাকা যখন আসে, তার সঙ্গে থাকে বন্টনের কিছু বিধি নিষেধ। কাজেই দানী নিমিত্ত মাত্র, দানী শুধু প্রতীক, দানী রক্তবীজ শিশুপাল, দানী সর্বত্র আছে। অর্থহীন তার অভিমান।" জমি ব্যবস্থার জটিলত াকে কেন্দ্র ক'রে সংঘাতকে যে পরিবেশন করেন লেখক, তেমনই দানীদের রক্তবীজ শিশুপাল হওয়ার চিত্রকে বারংবার উপস্থাপিত করেন। জে. এল. আর. ও অফিসারদের আপাতভাবে ধর্মপুত্রের মতো আচরণ করা অথচ প্রকৃতপক্ষে দানীর মতোই রক্তবীজ শিশুপাল হওয়ার চিত্র, কিংবা থানার বড়বাবুর সঙ্গে, দেউনিয়ার সঙ্গে অর্থের লেনদেনে স্ফীত হওয়ার ছবি তথা জমি সংক্রান্ত যাবতীয় হদিশ লেখক পেশ করেন গল্পের বয়ানে।

"তারপর একটা আপস হয়। এ আপস আগের বারের মত নয়, এ আপস দুই ধুরন্ধর প্রতিদ্বন্দ্বীর। তারপর সবকিছু চাপা পড়ে যায়। কিছু প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার হয়, আর বেশিটুকু হয় নির্বাচনের হাওয়ায়।" নির্বাচন সম্পর্কেও লেখকের যথার্থ মন্তব্য

ভোট ভারতবর্ষের মতো দেশে একদিকে পোস্টমর্ডানিজমের উত্তাল হাওয়ায় একশ্রেণীর মানুষ অবলীলায় ভেসে চলেছে, অন্য শ্রেণীর মানুষকে এক মহাতিমির গ্রাস করেছে। অভিজিৎ এই দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাই ভোটের সরল পাটিগণিত নয়, তার হিসাব নিকাশের ব্যর্থতার তাঁর রসায়নের প্রসঙ্গ নানা সূত্রেই দেখান। তাই দেখি, যে বিমল একদা ঢিলার কাছে রাজনীতি সম্পর্কে হাতে কলমে জেনেছিল, সেই বিমলই বর্তমানে মন্ত্রী হয়ে বক্তৃতামঞ্চে বক্তৃতা দিলে ঢিলা তার কাছে

অভিযোগ নয় আর্জি জানায়। আর্জি জানাতে গিয়ে ঢিলা 'হুজুর' শব্দে বিমলকে সম্বোধন করে। হুজুর শব্দ শুনতে একক ালে বিমলের খারাপ লাগলেও বর্তমনে তা মাননসই হয়ে যায়। লক্ষণীয়, এককালের রাজনৈতিক কর্মী ও মন্ত্রীর মনোভঙ্গি জাত বৈষম্যটি। অভিজিৎ বিমলের ভাবনাতেও পুনরায় এদেশীয় ভোটব্যবস্থার যথার্থ স্বরূপটিকে উপস্থাপিত করেন "যদিও সে জানে এ দেশে গরদ পরে মন্দিরে গেলে ভোট বাড়ে। মাল মাথায় দিয়ে মসজিদে গেলে ভোট বাড়ে, এ্যারে াপ্লেনের পাদানিতে দাঁড়িয়ে সদ্য পুত্রহারার গায়ে মাথায় হাত বোলালে ভোট বাড়ে, দুদিন আগে যার স্বামীখুন হয়েছে ত াকে ভোটের বাক্সে জবাব দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেও সত্যিই ভোট বাড়ে।" কিন্তু সেই মন্ত্রী মানুষটি ঢিলাকে চিনতে পেরে মঞ্চ থেকে নেমে নিজের কাছে টেনে নিতে পারে না, কেননা ঢিলাকে তারা নিষ্পি করে রেখেছে, তাকে আপনার করে নিতে গেলে সমবেত জনতার কাছে তা ভোট চাওয়ার ছলনা বলে মনে হতে পারে। মন্ত্রী তাই তড়িঘড়ি মঞ্চ থেকে নেমে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড আমলের ডাক বাংলোয় উঠে যায়। ঢিলাকে সেখানে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। পুরনো আমলের ডাকবাংলোয় পৌঁছে মন্ত্রীর মনে পড়ে যায় ঢিলার সঙ্গে পুরনো রসিকতার প্রসঙ্গ, মন্ত্রী লহমায় পৌঁছে যান পুরনো দিনের প্রসঙ্গে। কিন্তু ঢিলা মণ্ডল মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে না, বিধু বা মন্ত্রীও চায় না প্রসঙ্গে তা বেশি গভীর ভাবে নাড়াচাড়া করে দেখতে। এ আমাদের সময়ের বৃত্তান্ত, ক্ষমতা দাপটের হিগেমনির অন্তরালে মানুষের হারিয়ে যাওয়ার বৃত্তান্ত। এই গল্পের অনুসরণে আইনশৃঙ্খলা' গল্পটির পর্যালোচনা জরি। এই গল্পেও গ্রামের জমি সংক্রান্ত মধ্যস্থানীয় ব্যবস্থার রূপান্তরের কা হিনী এবং শ্রেণী সম্পর্খে জটিল টানাপোড়নের বিষয়টিকে পরিবেশন করেছেন গল্পকার।এই গল্পটিতেও অভিজিৎ প্রচলিত ছোটগল্পের সীমারেখায় বিষয়টিকে মানেনি। ছোটগল্পকে খণ্ডিত জীবনের অনুভবের কাহিনী করেই গড়ে তোলেন নি, বরং সামগ্রিক জীবনের রূপদানেই সচেষ্ট হয়েছেন। নিবন্ধকারের মতো ভাষ্য সংযোজনার মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিমণ্ডলটিকে উপস্থাপন করেছেন একই গদ্য যোজনার মধ্য দিয়ে। গল্পের প্রারম্ভেই তৃতীয় বিশ্বের পরজীবী অস্তিত্বের প্রসঙ্গটি কৌতুককর ভঙ্গিতে পরিবেশন করেন তিনি। বিশ্বায়নের দাপটে এদেশের ইতিহাসের হাতবদল, ত ার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের আমেরিকা যাত্রা প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে। আখিরা গ্রামে বিষ্ণুমূর্তি মাটির তলা থেকে উঠেছিল। যথারীতি তেল, সিঁদুর ও বেলপাতা জর্জরিত হয়ে মূর্তি বেদির একপাশে পড়েছিল। সাহেবদের সঙ্গে বিষ্ণুও জিপে ওঠে।" ইতিপূর্বে গ্রামে প্রকল্প প্রভৃতির কার্যকর ভূমিকায়জোতদার আধিয়ার কৃষক শ্রমিক সকলেই সজাগ হয়। অভিজিৎ কখনো নিবন্ধকারের কখনো কথকতা স্রষ্টার মতো, কখনো সাংবাদিকের ধরণে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ সংক্রান্ত বিষয়টিকে পরিবেশন করেন। এক্ষেত্রে দেখান যে তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি পরতে, প্রতিটি শিরায় শিরায় আমেরিকার দাপট ক্রিয়াশীল। "অধোনত অর্থনীতি উন্নয়ন সমস্যার একটি আদর্শ নমুনা হিসাবে বিষয়টি বিশদ হওয়ার দাবি রাখে।" এই ধরনের গল্পের বেশিরভ াগ ক্ষেত্রে অভিজিৎ একজন ব্যাঙ্ক কর্মীকে চরিত্র হিসাবে অঙ্কিত করেন, যে চরিত্রটি সকল স্তরের মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করেন এবং যিনি অবহেলিত মানুষজনের জন্য ভিন্ন কিছু ভাবেন, কোন প্রকল্প বা ঋণ দেবার কথা চিন্তা করেন, আবার সে চরিত্রটি উপরিস্তরের লোকজনের সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বলেন। গভীর নলকূপ বোরিং হওয়ার পরেও বিদ্যুৎ না আসায় প্রকল্প চালু হতে দেরি হয় কয়েকমাস। মন্ত্রীর মিটিং, ডি. এম এর দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারের তিরস্কৃত হওয়া, টেকনোক্রাট বুরোক্রাট লড়াই, কিংবা মন্ত্রীর সঙ্গে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত এবং দলগত বিরোধের অনুপুঙক্ষ বিবরণ উপস্থাপন করেন তিনি। এমন কি মিটিং এর সিদ্ধান্তও তুলে ধরেন গল্পকার। মাস কয়েক পরে মন্ত্রীর পৌরোহিত্যে প্রকল্প চালু হল। পঞ্চাশ বাহান্নজন কৃষকেরা ব্যাঙ্ক ঋণ পেল, এক লক্ষ টাকারও বেশি যার অর্ধেক উপকরণে ব্যয়িত হল এবং এই উপকরণ সরবরাহের অ াদেশ পেল সাধন চৌধুরী। এর কিছু পরে বোরো ধানের মরসুমে সজীব ধানের চারা গড়ে উঠলে উজ্জ্বল তামাটে রঙের পরিশ্রমী টুইলা ও ঈষৎ মঙ্গোলীয় ছাপের হলুদাভ কুশলীর ছবি তুলে নিয়ে গেলেন আমেরিকান সাহেবদের নির্দেশে ফটে াগ্রাফাররা। ছবি তোলার পরে আমেরিকান সাহেব ও ব্যাঙ্ককর্মীদের যে সভা হয় তাতে কৃষকদের নিজেদের অবস্থায় ফের াবার জন্য নানা রকম বৈজ্ঞানিক এবং স্কেমেটিক উপদেশ দেওয়া হয়। গ্রামের স্বভাব কবি পাশকুটু, আমেরিকান সাহেবকে ইন্দ্রের মতো বর্ণনা করে দীর্ঘ ছড়া নাকি সুরে গাইল এবং প্রত্যেকেই বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তৃতীয় বিশ্বের দিকে ধাবিত এক আগ্রাসী লেহন ক্ষমতাকে দেখালেন অভিজিৎ, যেখানে বিশ্বব্যাঙ্কের দাপটে আমাদের বিকলাঙ্গ অস্তিত্বটি অ ারও একবার প্রকট হয়ে ওঠে। এরপর অভিজিৎ উপনিবেশ শাসনে গড়ে ওঠা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং লোকায়ত দরিদ্রশ্রেণীর সমান্তরাল পথরেখাটিকে চিনিয়ে দিয়ে দেখালেন যে তারা কখনোই একত্রেই মিলিত হয় না। তবুও শিক্ষিত

মধ্যবিত্ত অফিসারটির সম্মুখে যখন মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করে ব্বিব্যাঙ্ক আমেরিকার মতো দূরদেশে থেকে এদেশে কোন অর্থ বিনিয়োগ করে অথবা পাশকুটু যখন বলে ব্বিব্যাঙ্কে মহাজন ও সুশীল মণ্ডল মহাজনের পার্থক্য প্রসঙ্গেও তখন সে তার কে ান উত্তর দিতে পারে না। মধ্যযুগীয় সামন্ত্রতন্তের শাসন শোষণের প্রতীক সুশীল মণ্ডল আর নব্যধনতন্ত্রের প্রতিভূ ব্বিব্যাঙ্ক মহাজন বঞ্চিত মানুষজনের কাছে এক হয়ে দেখা দেওয়ায় ব্বিব্যাঙ্কের হয়ে ঋণদাতা দিব্যেন্দু নিজের অফিসের ক্ষীয়মানত াকেই প্রত্যক্ষ করে। 'ঋষির শ্রাদ্ধ' গল্পের ব্যাঙ্ককর্মী 'আমি' --র মতোই ব্যাঙ্ককমী দিব্যেন্দু নতুন কিছু করতে চাওয়ার বাসন ায় আজকের এই দেশের এক বাস্তবের শরিক হয়েও ব্বিায়নের দাপটে নবতর সংস্কৃতির আধিপত্যে লালিত হয়েও অন্য এক ঢ়তার মুখোমুখি হতে চায়। তাই সে টুইলাসহ পনেরোজন চাষীকে আলু চাষের জন্য মনোনীত করে, কিন্তু কিছু চাষীকে গম আবাদ করার জন্য ঋণ দেয়। সবচেয়ে লাভবান হয় টুইলা, সে আলু ও পটল বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা রোজগার করে। গম চাষীরা ভাল ফলন পায় --- "ফলত প্রথমবারে সমস্ত গ্রামটাতে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো। আধুনিক প্রযুক্তি কৃষিতে যে একটা বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে এটা সমস্ত স্তরের কৃষকরা কুসংস্কার এবং নানা রকম ভয় ও ভীতি সত্ত্বেও বুঝল।"এরপরে খেতমজুররাও বাড়িতে হাল রাখার ব্যবস্থা করেন যাতে সেই হাল অন্যের জমিতে চাষ করতে পারে বা অ াধিজমী চাষ করতে পারে যাতে নামমাত্র মজুরিতে অমানুষিক পরিশ্রম না করতে হয়। আবার পাশাপাশি টুইলা ও তার সতীর্থ চাষীরা অসময়ের ফসল ধান ও গম জমির মালিকদের অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে দিয়ে এল। গল্পের তৃতীয় স্তরে পৌঁছে গল্পকার ব্যক্তি কাহিনীটিকে জটিল শ্রেণী সংক্রান্ত বৃত্তান্তের মধ্যেপ্রবেশ করিয়ে দেন। ----

"চাষবাস সম্পর্কে যারা দিন দিন হতাশ হয়, সেই ছোটো চাষি ও বর্গাদারেরা একটু নড়েচড়ে বসে এবার। টুইলার অ ালুপটলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিস্ফোরণ ঘটাল জোতদার এবং বড়ো চাষীদের মাথায়" এ গল্পেও অভিজিৎ শোষক শ্রেণীর পে াশাক বদল, ক্ষমতাসীন শক্তির পোষণ তথা প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির শূন্যগর্ভতার প্রসঙ্গেরই উল্লেখ করেন। তাই দেখি, ছোট চা ষি, বর্গাদার, আধিয়ার আর জোতদার তথা বড়ো চাষিদের মধ্যে শু হল শ্রেণী সংঘাত। অভিজিৎ এই শ্রেণী সংঘাতকে উত্থাপন করার পাশাপাশি গল্পের বয়ানে নিয়ে এলেন দুটি প্রসঙ্গ। প্রথমটি আপাত কৌতুকের বাতাবরণে উপস্থাপিত করেছেন। হল কর্ষণের দিনে গাভী ও বলদ সহযোগে হাল ধরে ডোমন এবং গ্রামের লোকেরা একে ব্যাভিচার বলেই মনে করে এবং তাকে প্রভূত প্রহার করে। গ্রামীণ উন্নয়নের পাশাপাশি লোকায়তসংস্কারের প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে গল্পকার উপনিবেশোত্তর গ্রামীণ সমাজকেই চিহ্নিত করলেন। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটিতে ব্যাঙ্ককর্মী দিব্যেন্দুর ডাটা সংগ্রহের মধ্যে এ দেশীয় শ্রেণী ও সমাজ তথা এদেশীয় বাস্তব চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। দিব্যেন্দুর সার্ভেতে একদিকে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের শাসন - শে াষণের দিকটি চিহ্নিত হয়, অন্যদিকে সেই সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ স্থানীয়দের ঔপনিবেশিক শিক্ষা গ্রহণ কিংবা ভূমিকে মর্যাদা দিয়ে শ্রম করার মানসিকতা --- যুগপৎ দিকের প্রতি অনীহার প্রসঙ্গটিই প্রকটিত হয়। তাই দেখি, আখিরা গ্রামের মোট পঁ াচশো সাড়ে পাঁচশো সেচসেবিত জমির মধ্যে চারভাগের এক ভাগ জমির মালিক প্রায় দুশোটি ছোট ও প্রান্তিক কৃষক, অন্য তিনভাগ জমির মালিক মাত্র ছয়টি পরিবার। এই ছয়টি পরিবারের প্রায় সকলেই অলস, কর্মবিমুখ এবং ধান্ধাবাজ। সুদ খাটিয়ে চড়া টাকা আদায় করা এদের পরিবারের নারীদের কাজ। বিদ্যালয়ের সীমানার কাছাকাছি পৌঁছায় মাত্র এবং সেইটুকু বিদ্যাতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এইভাবে গ্রামীণ সমাজের একটি প্রতিবেদনকে উপস্থিত ক'রে অভিজিৎ দেখালেন সেই সমাজে ভূমি সংস্কার কতটা জরি এবং সেই সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের বাদ কীভাবে পুঞ্জীভূত থাকতে পারে। এরপরেই গল্পকার ভূমিকেন্দ্রিক শ্রেণী সংঘর্ষের চিত্র অঙ্কন করলেন বর্তমান র াজনৈতিক পার্থক্যকে, এবং শোষকের ভোল বদলকে তিনি উপস্থাপিত করলেন। উপন্যাসিকঅভিজিৎ সেন তাঁর 'বর্গক্ষেত্র' উপন্যাসেও আইনশৃঙ্খলার প্রহসন, ভূমিসংস্কারের বেনিয়ম এবং পার্টিকর্মীদের শূন্যগর্ভ ক্রিয়াকর্মকে অঙ্কন করতে গিয়ে বলেছিলেন "আইনের সংখ্যা যত বাড়ে, ফ্যাকড়া তত বাড়ে ফ্যাকড়া যত বাড়ে পয়সা আসার অলিগলি ততই বেশি ক'রে গজিয়ে ওঠে।... সব পক্ষেরই এবং সব প্রশাসনের লক্ষ্য যাতে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। বর্তমান প্রশাসনও সেদিক গিয়ে ব্যতিক্রম নয়! আইন শৃঙ্খলার সমস্যা না হয়, প্রতিপক্ষ কোনো রকম নালিশ না উঠাতে পারে সেদিকে দল ও প্রশ াসন বড়ো কড়া নজর রাখে। ...স্বজন পোষন ও পয়সা বর্গা রেকর্ডের ক্ষেত্রে এবার বিরাট ভূমিকা নিয়েছে।" এই গল্পেও শ্রেণী সংগ্রামের পটভূমিতে প্রান্তিক চাষীদের জোতদারের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হওয়ার কাহিনি অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গটিরও বারবার উল্লেখ করেছেন। লেখকের বর্ণনায় তার অন্তঃসারশূন্যতার দিকটিও চিহ্নিত

হয়েছে---- “ফলে বিষয়টা যাবতীয় বিবেচনায় উর্ধ্বে আইনশৃঙ্খলা নামক একশিখণ্ডীর দপ্তরে চলে যায়।” চাষীদের সংলাপেও প্রসঙ্গটির উল্লেখ রয়েছে --- “আইন সিংখলা?”

“-----নাগরোৎ ভাসামো। পেটেৎ ভাত থাকেলে আইন, পাছাৎ কাপড় থাকলে সিংখলা।” কিংবা যোগেন যে আখিরা ও বোলতরার কমরেট্ হিসাবে পরিচিত, সে-ও জোতদারের দালালী করতে গিয়ে বলে ওঠে “আইন শৃঙ্খলা নিজের হাতে নেওয়া চলবে না। আইন ভঙ্গ করা চলবে না।” এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য অভিজিৎ কুশলতার সঙ্গে পরিবেশন করেন জোতদারের সুযোগ বুঝে বিশেষ রাজনৈতিক দল ঢুকে পড়াকে---- “ভোটের পরে নতুন জামা অনেকেই গায়ে দিয়েছে। সতীশের জামাটা তার ভেতরে একটু বেশি রঙিন। তবুওএই নতুন কর্মীরাই টুইলার মতো প্রান্তিক চাষীদের গ্রাস করে, তাদের আধিজমি কেড়ে নিতে চায়। জিতেন সেই জমির অন্যতম সফল চাষী তাই টুইলার জমিই হস্তগত করে সতীশের মতো জোরদার চাষী। যোগেনের মধ্যস্থতায় দু’একজন প্রান্তিক চাষী বশ মানলেও টুইলা তা মানতে চায় না, কেননা জমির থেকে বড় তার কাছে আর কিছুই নেই। মহেন্দ্র আধিয়ারদের নেতৃত্ব দিলে এবং টুইলা তার মতেরদৃঢ়তা বজায় রাখলে সাময়িকভাবে জোতদাররা নিরস্ত থাকলেও রেষারেষি দুরভিসন্ধি বা চক্রান্ত বজায় থাকল। এর আগেই যোগেনকেআধিয়ারদের উপিনের মতো ছেলের দল কালি পড়া এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি মাথায় পরিয়ে দেয়। এবার জোতদাররা মহেন্দ্ররপুকুরে ঢেলে দেয় বিষ, মহেন্দ্র পুত্র উপিনও পরের দিন তাদের কয়েকটি পুকুরে বিষ ঢেলে তার বদলা নেয়। টুইলার বাড়িতে ডাকাত আসে, তাকে হত্যা করে তারা, তার বধূ কুশলী সেই ডাকাতদের দ্বারা ধর্ষিত হয়। সংজ্ঞাহীন কুশলীকে পরের দিন হাপাতালে নিয়ে গেলে প্রাণ ফিরে পায়, কিন্তু হারায় বাকশক্তি। তার গর্ভে থাকা চারমাসের শিশু সন্তানটি বেঁচে থাকে। প্রমত্ত পশুদের দ্বারা কুশলী ধর্ষিত হওয়ার পরেও টুইলার উত্তরাধিকারী বেঁচে থাকার মধ্যে দিয়ে অভিজিৎ সংগ্রামের জয়মানতার দিকটি প্রতীকায়িত করেছেন। গল্পটি এরপর অন্যস্তরে পৌঁছায়। টুইলার জমি আমন মরসুমে আহাজ না হয়ে পড়ে থাকে। ক্যালেণ্ডারে ছবি তোলা টুইলা ও কুশলীর সবুজ ফসলে ভরা মাঠ আগাছায় রূপান্তরিত হয়। জমি চাষ না করে ফেলে রাখার জন্য সুযোগ বুঝে জমির মালিক সতীশ কোর্টে নালিশ করে টুইলার স্ত্রী কুশলীর বিদ্ধে। মহেন্দ্র বাকশক্তিরহিত, বিহ্বল দৃষ্টির অধিকারী কুশলীকে নিয়ে কোর্টে আসে, লড়াইকে অব্যাহত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কোর্টের মধ্যে দেওয়ালের টাঙানো ক্যালেণ্ডারে নিজের ও স্বামীর ছবি দেখে কুশলীর মস্তিষ্কে উপলব্ধির সঞ্চার হয়। কুশলীরশরীর স্বেদসিক্ত হয়ে ওঠে। মহেন্দ্রর স্ত্রী চেলামণি কোর্টের বাইরে পুষমানুষদের চলে যেতে বলে। “দরজার বাইরে হতভম্বের মতো মামলাবাজ মানুষ উকিল, হাকিম এবং আগ্রহী মহেন্দ্র বিমূঢ় হয়ে থাকে। খানিকক্ষণ পরে নবজাতকের প্রথম ঘোঘণা শোনাযায় তীব্র চিৎকার।” যে সংগ্রাম টুইলার মৃত্যুতে সাময়িকভাবে স্তব্ধহয়ে গিয়েছিল টুইলার সন্তানের তথা নবজাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের ঘোষণা যেন প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে। মহেন্দ্র যে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে, টুইলার অবর্তমানে বাকশক্তিরহিত কুশলীকে নিয়েই কোর্টেএসেছে, পিছু হটেনি। সুতরাং যে আবেগে দীপ্ত হয়ে ওঠে। হাকিমকে সে একথা বলতে দ্বিধাবোধ করে না---- “মিরতো আধিয়ার টুইলা বম্মনের ওয়ারিশ আপনার এজলাশোৎ হাজির।” এ যেমন উত্তরাধিকারের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সরব ঘোষণা, তেমনি সেই ঘোষণায় বর্তমানের আইন শৃঙ্খলকে তছনছ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ধবনিত হয়--- “সেই শব্দে বন্ধ ঘরের কাঁচের দরজা, জালনা ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে।” উপনিবেশোত্তর ভারতবর্ষে যে আইন জনগণের মুখে দুবেলা দুমুঠো খাবার তুলে দিতে পারে না, যে শৃঙ্খলা মানুষের ন্যূনতমলজ্জা নিবারণের উপায়টুকু রাখে না, রমণীর ইজ্জতটুকু রক্ষা করতে পারে না সেই আইনশৃংখলা আসলে, তার প্রয়োজন কতটুকু? বিশ্বায়নের দাপটে, বিশ্বব্যাঙ্কের আধিপত্যে আমেরিকার প্রতাপের, পঙ্গু রাজনীতির বিকৃত অবস্থায় থেকেও গল্পকার ভিন্নএক ইতিবাচক দিগন্তের উন্মোচন ঘটান এই চিত্র সংযোজনের মধ্য দিয়ে।

সংগ্রামের জায়মানতা তথা শোষিত মানুষের সংঘবদ্ধতার সদর্থক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে অভিজিতের ‘দেবাংশী’ গল্পে। গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর নোবেল পুরস্কার গ্রহণের সময় দেওয়া ভাষণে ইউরোপকে অনুরোধ করেছিলেন লাতিন আমেরিকার মতো দেশকে বুঝতেতাদের নিজস্ব পুরাবৃত্ত দিয়ে। তাঁর বক্তৃতার অন্তিমে পাওয়া যায় এক কল্পরাজ্যের আশ্বাস যেখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। লাতিন আমেরিকার গল্প - উপন্যাসে ঔপন্যাসিকরা নিজস্ব ইতিহাসকে খুঁজতে চান লোকায়ত সমাজের মধ্যে, পুরাবৃত্তের মধ্যে, ব্রাত্য অপাংক্তেয় জনেদের লোকধর্ম থেকে, তাদের সংস্কার বিশ্বাস থেকে। অভিজিৎ তাঁর গল্পে বারংবার অঙ্কন করেন লোকায়ত মানুষজনের আচার, সংস্কৃতিকে, তাদের জীবনের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসকে। সংস্কারের প্রাবল্য

মানুষকে কেমনভাবে পরিবর্তিত করে, তাকে কতটা অসহায় করে--- সেই বিষয়টিকে অবলম্বন ক'রে ইতিপূর্বে বাংলা ছোটগল্প লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনী' ছোটগল্পের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যায়, যেখানে সংস্কারের আধিক্যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা লুপ্ত হয়ে অপর সত্তাটি বড় হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তি চূড়ান্ত ট্রাজেডি ঘটে। আবার লোকজীবন অবলম্বন ক'রে নিজস্ব অস্তিত্ব উদ্ধারের প্রয়াস আমরা দেখি সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাসে কিংবা ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রে। আবার লোকায়ত সমাজের একটি যুগের অবসানের চিত্রও পরিবেশিত হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনী' ছোটগল্পের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যায়, যেখানে সংস্কারের আধিক্যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা লুপ্ত হয়ে অপর সত্তাটি বড় হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তির চূড়ান্ত ট্রাজেডি ঘটে। আবার লোকজীবন অবলম্বন ক'রে নিজস্ব অস্তিত্ব উদ্ধারের প্রয়াস আমরা দেখি সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাসে কিংবা ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রে। আবার লোকায়ত সমাজের একটি যুগের অবসানের চিত্রও পরিবেশিত হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কিংবা 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র মতো উপন্যাসে। কিন্তু 'দেবাংশী' গল্পে কেবল ব্যক্তির সত্তার সঙ্গে লোক বিশ্বাসে আরোপিত সত্তাটির দ্বন্দ্ব তথা ব্যক্তিক ট্রাজেডিই পরিবেশিত হয়নি। আবার, এই গল্পটি কেবল লোকাচার - লোকবিশ্বাসে স্থিত কোন গোষ্ঠী তথা কৌম জীবনের কাহিনীও নয়। এর সঙ্গে শ্রেণী সংঘাতের মতো গুত্বপূর্ণ তৃতীয় মাত্রাটিও যুক্ত করেছেন গল্পকার। তাই দেখি, সর্বপ্রকার অবনমনের শিকার শোষিত সমাজ দীর্ঘ অবিচারের বিদ্ধে দেবাংশীকে অবলম্বন ক'রে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। লোকবিশ্বাস তাই তছনছ হয়ে যায় না; 'ডাইনী', 'জীবিত ও মৃত' অথবা 'দেবী' ছোটগল্পের মতো তাই ব্যক্তিক ট্রাজেডি অন্তিমে ঘটে না। বরং লোকবিশ্বাস জীবন্ত থেকেও দেবাংশী অতিলৌকিকতা আবরণ থেকে নিতান্ত রক্তমাংসের মানুষে ফিরে আসতে পারে, মানুষের আশ্রয় থেকেও তাদের ঘনিষ্ঠ হতে পারে। অতিপ্রাকৃত শক্তি দেবাংশীকে নির্ভর ক'রে একদা বেঁচেছিল শোষিত গোষ্ঠী, আবার তারা দেবাংশীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে শোষক সমাজের বিদ্ধে শপথ নিতে পারে।

লোহার গ্রামের সারবান মানুষের কাছ থেকে অকৃত্রিম ও অপরিসীম শ্রদ্ধা পায়, কেননা সে দেবতার অংশবিশেষ তথা দেবাংশী। লোকের বিশ্বাস যে তার উপর দেবতা আশ্রয় করেন। এই সময় দেবাংশীর ভর হয় আর যখন তার ভর হয়, তখন সে যে কথা বলে তা কেবলমাত্র কথা নয়, দৈববাণী। তার কালী কিংবা মনসাথানের যৎসামান্য মৃত্তিকা অসাধ্যসাধন করতে পরে। "যক্ষা, হাঁফানি, কুষ্ঠর মতো রোগও সেই মাটি ধোওয়া জল খেলে সেরে যাবে। বন্ধ্যা রমণী সন্তানবতী হবে, পঙ্গু নিজের পায়ে হাঁটবে, অন্ধ এই পৃথিবীর আলো, বৃক্ষলতা সব দেখবে। বুজে যাওয়া পুষ্করিণী জলে মাছে কেলি করবে, বাঁজা গাই রাত দুপুরে ডাক তুলবে পাড়া কাঁপিয়ে, যে গাইয়ের বাছুর মরে দুধের অভাবে, তার মরা ওলানে দুধের বান ডাকবে। সাপ, বিছা, ভূত - প্রেত, মাদার আর জিনের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে কোলের শিশু, পোয়াতি স্ত্রীলোক। মায় যে সব লাউ - কুমড়ো - সিম ঝাঁকায় কেবল জালি আসে আর ঝরে মরে যায় সে সব গাছওফলভারে ঝাঁকা ভেঙে ফেলতে চাইবে।"

এর শু পঞ্চাশ বছর আগে থেকে। পঞ্চাশ বছর আগে বিষহরির থানের সামনে গোবর লেপা চৌহদ্দিতে খেরা খেলায় আসে ওঝা, সাপুড়ে, গুণমানের দল। মাত্র দশবছর বয়সে সারবান লোহারের শ্রাবণ সংক্রান্তির খেরা খেলার দিন ঢোলকের শব্দে দেহের অভ্যন্তরে এক অব্যক্ত অনুভূতির সঞ্চার হয়েছিল। সে পরিণত হয়েছিল দেবাংশীতে। অথচ ইতিপূর্বে বালক সারবান রাখলি করত রঘুনাথ মণ্ডলের বাড়িতে। সারবানের পিতা হীরামন লোহার পঞ্চাশ টাকা ঋণ নিয়েছিল দৈত্যারির পিতা রঘুনাথ মণ্ডলের কাছে তার স্ত্রীরঅসুখের জন্য। সারবানের মা মারা যায়, বাবা ঋণ শোধ ক'রে জমি ফিরে পাবার আশায় অপরিসীম পরিশ্রম করতে গিয়ে মারা যায়। ত্রিসংসারে সবাইকে হারিয়ে বাবার ঋণ শোধ করতে বালক সারবান রঘুনাথের রাখালি করে। দেবাংশী সারবানকে কিনে নিয়ে যায় বিরাম। খেলা উৎসবে ঢোলক বাজা, বিরাম গুণমানের কীর্তি, হাজার মানুষের সমারোহ প্রভৃতির মাধ্যমে লোকায়ত সমাজে বিশেষ উৎসবের অনুপুঙক্ষ চিত্র অঙ্কন করলেন লেখক। লোক উৎসব সংক্রান্ত কার্নিভাল তত্ত্বে বাখতিন বলেছিলেন "that the carnival is the place for working out, in a concretely sensuous, half – real and half-play-acted form, a new mode of interrelationship between individuals, counter posed to the all powerful socio – hierarchical legitimized by carnival permits the latent sides of human nature to reveal and express themselves' (1984,123), a suggestion that obviously has a bearing upon his interest in

Dostoevsky's use of eccentrics in his FICTION." (A Glossary of Contemporary Literary Theory', Fourth Edition, Jeremy Hawthorn, Arnold, 2000, Page – 37)। কার্নিভাল এক বিশেষ উৎসব, যা আদিম কৌম সমাজে অনুষ্ঠিত হয় এবং উৎসবের মধ্যেই প্রকাশিত হয় শোষক সমাজের বিদ্ধে এ যাবৎ চাপা ক্ষোভ। অভিজিৎও দেখালেন সমাজে প্রতিকূল বাস্তবতায় পীড়িত মানুষেরা অবলম্বন খোঁজে গুণমান পাতা ওঝা দেবাংশীর মধ্যে থেকে। এ এক দিক থেকে লোকায়ত সমাজের আদিম সংস্কার, অন্যদিকে রূঢ় নৃশংসতায় বেঁচে থাকার উপাদানও বটে---- 'তারপর থেকে প্রতিটি অনুষ্ঠানে এবং অনুষ্ঠানের বাইরেও সারবান নতুন নতুন সব অভিযোগ শুনতে থাকে। সমস্যাগুলো কিছু নতুন নয়, কিন্তু মানুষ দেবাংশীর কাছে এই ধরনের অভিযোগ আনতে শু করেছে, এটাই নতুন নয়, কিন্তু মানুষ দেবাংশীর কাছে এই ধরনের অভিযোগ আনতে শু করেছে, এটাই নতুন।" সামন্ততান্ত্রিক সমাজে শোষিত মানুষের অবলম্বন হিসাবে দেব াংশীকে চিহ্নিত করলেন লেখক। তাই দেখি, সেতু বর্মন দেবাংশীর কাছে আধিজমি সংক্রান্ত আবেদন জানালে সে দৈত্যরিকে জমির দখল করেছিল, সেই একই ঋণের দায়ে রঘুনাথ পুত্র দৈত্যারিও সেতুকে ঠকাতে চায়। দেবাংশীর পর ামর্শ মত সেতু দৈত্যারির জমি না ছাড়লে দৈত্যারি দেবাংশীকে ডেকে পাঠিয়ে রক্তচক্ষু দেখিয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য অ াদেশ দেয়। দৈত্যারির বাড়িতে দেবাংশীর ভর আসে এ সেই ঘটনার ছ সাত দিন পর দৈত্যারি সর্পদংশনে মারা যায়। এই ঘটনার পর সারবানের দেবাংশী রূপ আরো প্রকট হয়ে ওঠে। কেবল শোষিত সমাজে নয় শোষক সমাজেও সে হয়ে ওঠে মুক্ত প্রতীক--- "যেন সে একটা অলৌকিক প্রকল্প, যার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধন করা যায়, যে কোনো শত্রুতার নিষ্পত্তিও কর া যায়। দরিদ্র অসহায় মানুষ তাকে কল্পতর সমগোত্র জ্ঞানে অসম্ভব সব বাসনা নিবেদন করতে থাকে। আরসম্পদশালী বিত্তবানেরা তাকে ব্যবহার করতে চায় ঘুষ দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে গোপনে এবং প্রকাশ্যেও। কেউ জানতে চায় না খোঁজও নেয় না যে, সারবান লোহার কেন সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে তার পৈতৃক পাঁচ বিঘা সম্পত্তি স্ব-শাসনে আনার স্বপ্ন দেখে অথচ পারে না। এই স্ববিরোধ কেউ বোঝে না, এমন কি তার স্ত্রী পুত্ররাও নয়।" অন্যদিকে দেবাংশীর দেবী মহিমা প্রকট হয়ে ওঠে দ্বিতীয় একটি ঘটনাতেও। জোতদার রোহিনী সনাতনকে দিয়ে আধিচাষী জাফরের বিদ্ধে নালিশ জানায় কোর্টে। দরিদ্র জ াফর দেবাংশীর নাম নিবেদন করতে উপস্থিত হলে দেবাংশী শঙ্কিত হয়। কেননা সে তা নিজেকে মানুষ বলেই মনে করে, ম ানুষ হতে চায়, কিন্তু লোক বিশ্বাস এত প্রবল যে তা হবার নয় সেও তা জানে। তাই জাফরের আবেদনে তাকে সাড়া দিতেই হয়। সারবান জাফরকে দিয়ে রোহিনীকে ডেকে পাঠায়। এ সংবাদ পৌঁছনো মাত্র রোহিনীও তার স্ত্রী পরাজয় স্বীকার করে, দেবাংশীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। দৈত্যারির পরাজয়ে দেবাংশী অসহায় হয়েছিল আর রোহিনীর আত্মসমর্পনে ভয় ত াকে গ্রাস করে। সে নিজে বোঝে এভাবে চিরকাল চলতে পারে না। গভীর রাতে সে তার স্ত্রীকেও সে কথা বলে। কিন্তু তার স্ত্রী সে কথায় আতঙ্কিত হয়। সারবানের দেবী মাহাত্ম্য যত বৃদ্ধি পায় সারবান তত ব্যাকুল ভাবে তা থেকে মুক্তি পেতে চায়। সে বিষহরির কাছেও মুক্তি প্রার্থনা করে। আসলে যে পরিমণ্ডলে সারবান কিংবা বিরামের মতো মানুষজন বেড়ে উঠেছে সেখানে লৌকিক অলৌকিকের সীমারেখা যায় মুছে, তাদের কাছে যে বাস্তবতা প্রতিকূল তা বারবারই নিয়তি তাড়িত বলে মনে হয়, প্রতিবন্ধকতাকে তারা বিধাতাসৃষ্ট বলেই মনে করে। তাই আধিদৈবিক পদ্ধতিতেই তারা তাদের মোকাবিলা করতে চায়। এর বিপরীতে গল্পকার স্থাপন করেন শোষক সমাজের প্রতিনিধিবর্গকে। তাই দেখি রঘুনাথ দৈত্যারি বিনোদের চরিত্রগত পার্থক্য বিশেষথাকে না। দৈত্যারির পুত্র বিনোদ শহুরে জীবনের অতিরিক্ততায় অভ্যস্ত এবং তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তির মানসিকতা তার মধ্যে সর্বদা সক্রিয়। সেতুর সঙ্গে যে বিরোধের একদা নিষ্পত্তি ঘটেছিল দৈত্যারির অপমৃত্যুতে সেই পুরনো বিরোধই জাগিয়ে তুলতে চায় বিনোদ। কেননা বিনোদ অর্থ এবং নারী দুই বিলাসেই মগ্ন আর সেতুর বা ড়িতে এসেছে বিবাহিত কন্যা বণী। সুতরাং ঋণ আদায়ের অজুহাতে বিনোদ বাণী দর্শন করে এবং সেতুকে তার পাওনা ট াকার দ্বিগুণ তিনদিনের মধ্যে ফেরত দিতে বলে। সারবানের দৈবীশক্তির প্রভাবে শোষিত সমাজ আত্মশক্তি ফিরে পেতে শু করেছিল আর এই শোষিত সমাজের একজন ছিল সেতু। সুতরাং সে নিজেকে দেবাংশীর প্রভাবে বলীয়ান মনে করেছিল এবং বিনোদকেও তার কথার ইঙ্গিতে সে কথা বুঝিয়েও দিয়েছিল। এই ঘটনার পর শ্রাবণ মাসের একরাতেসেতুর কন্যা ব াণী লুঠ হয়। ধর্ষিতা হয়ে পরের দিন সে নিজেই তার পিতৃগৃহে ফিরে আসে। শ্রাবণের সংক্রান্তিতে উৎসবের দিন উপস্তিত হলে সারবান লোহার দেবাংশীর পরিধানে নিজেকে উপস্থিত করে বটে, কিন্তু দেবাংশীর শরীরের সেই স্বেদকম্প বা অস্থিরতা জাগ্রত হয় না। এ যাবৎকাল যে দ্বন্দ্ব তাকে অহরহ পীড়িত করেছে তা থেকে মুক্ত হতে সে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করে যে সে দেবাংশী নয়, একজন সাধারণ মানুষ "ময় সারবান লোহার, বাপের নাম হীরামন লোহার, তোমাহরের আর

দশজনের মতো একজন সারাধন মানুষ।" অন্যদিকে কৌম সমাজের একমাত্র শক্তি দেবাংশীর কাছে নিজেদের দুর্দশার কথা নিবেদন করব বলে এসেছিল অত্যাচারিত বাণী। কিন্তু বাণী সে কথা জানতে চায় না, কেননা তার একমাত্র অবলম্বন ছিল অত্যাচারিত বাণী। কিন্তু বাণী সে কথা জানতে চায় না, কেননা তার একমাত্র অবলম্বন ছিল দেবাংশী, তার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন দেবাংশীর কাছে নিবেদন করলে সব অন্যায়ের প্রতিকার হবে। সুতরাং সে আশা ভঙ্গের যন্ত্রণায় কাতর, অবিশ্বাসের ঘৃণায় অস্থির। সারবান দেবাংশী-সত্তা থেকে মুক্ত হয়, অলৌকিক সংস্কারের গুরভারকে খসিয়ে দেয়, উপরন্তু গ্রহণ করে আরো প্রত্যয়যুক্ত গভীর দায়িত্ব। উপস্থিত কৌম সমাজের জনগনকে, শোষিতগণমানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে বিনোদের চরম অন্যায়ের প্রতিকার চায়। উপস্থিত জনগণের মধ্যে মজা দেখতে আসা বিনোদকে যেমন অত্যাচারী হিসাবে বাণী চিনিয়ে দেয়, তেমনি সারবানও প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদে উত্তাল হওয়ার জন্যই শোষিত সমাজকে উৎসাহিত করে। "হঠাৎ সমস্ত মানুষ একযোগে বিনোদ এবং তার সঙ্গীর দিকে ঘুরে দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। সারবান এগিয়ে আসে বিনোদের সামনে। বলে মানুষ দুইট মহাপাপী। তুমরা যারা বাপ আছেন, ভাই আছেন, আপন আপন বেটির, বুনের ইস্তিরির ইজ্জত বঁাচাবার দায় তুমাহোরের সববার। তুমরা যদি সববাই চান যে পাপবন্দ হইক, তবেই সে পাপ বন্দ হবে। ই দায় দেবাংশীর একার নয়।" সমবেত জনতাকে এইভাবেঘুরে দাঁড়াতে দেখে বিনোদ ও তার সঙ্গী আতঙ্কিত হয়, পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করে এবং অবশেষে গণ্ডির ভিতরেই প্রবেশ করে। শোষকের প্রতীকায়িত আত্মসমপর্নের এবং শোষিতের সংঘবদ্ধতার চিত্র এঁকে লেখক এক নতুন জগৎ নির্মাণ করলেন। একদা অলৌকিক সত্তার অধিকারী হিসাবে দেবাংশী প্রতিভাত ছিলেন, আর আজ সেই সমাজেরই নেতা হিসাবে উপস্থাপিত হলেন। এই ভাবেই লৌকিক ও অতিলৌকিক জগতের বেড়াজালকে ভেঙে কৌম সমাজের বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভেদরেখাটি মুছে ফেলে রাজনীতি, সমাজনীতির মাত্রাকে সংযুক্ত করে ব্যক্তির উত্তরণ ঘটান লেখক।

'দেবাংশী' গল্পে সংস্কারের নির্মোক খসে ধ্বস্ত সমাজে মানবিকতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে সারবান। অন্যদিকে 'ব্রাহ্মণ্য' গল্পে যুগ যুগ বাহিত সংস্কারের শিকড় আমাদের লোক সমাজে যেমন প্রচলিত, তেমনি তা ভিন্ন ধরনে বহমান আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজেও। অভিজিৎ তাঁর একাধিক গল্পে ব্যাঙ্ককর্মী কে চরিত্র অঙ্কন করেছেন, কোন কোন গল্পে কথক চরিত্রটিই ব্যাঙ্ককর্মী। 'ব্রাহ্মণ্য' গল্পে নচিকেতা রাইনগরের ব্যাঙ্ক কর্মী। নদীখাতে পৃথক হওয়া নিম্নভূমির এই অঞ্চলটিতে মানুষ নিপায় হয়েই বাস করত। নিম্নবর্গ অধ্যুষিত এই অঞ্চলটিতে মানুষ ছিল খুবই দরিদ্র কারণ সেখানে ফসল হত প্রায় নামমাত্র। সুতরাং সেই দরিদ্র মানুষদের কাছে ব্রাহ্মণদের প্রাপ্তি বলতে কিছু ছিল না, তাই সচরাচর তাদের আগমন ঘটত না। অবহেলিত মানুষগুলির কাছে অন্যান্য বহু প্রত্যাশিত অথচ দূরবর্তী বস্তুর মতই ব্রাহ্মণও ছিল কাঙ্ক্ষিত ও অভিপ্রেত। কিন্তু গত বিশ - পঁচিশ বছরে বরিন্দের এই অঞ্চলের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগেই বলেছি অভিজিতের ছোট গল্পে এই পরিবর্তনের অনুপুঙ্ক্ষ পরিচয় আমরা পাই একাধিক গল্পে। পাম্প বসিয়ে সেচসেবিত এই অঞ্চলে অসময়ে ও উচচফলনশীল ধান উৎপাদন করা হয়। দরিদ্র মানুষ গুলি বর্তমানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। শোষকের শোষণ কৌশলের অভিনব উপায়, রাজনৈতিক দূরবর্তী বস্তু ব্রাহ্মণকে কাছে পাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। উত্তর উপনিবেশকালে ভিন্ন বয়ান রচনায় উৎসাহী অভিজিৎ লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস, সংস্কার কিংবা শ্রেণী সংঘাতকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি দেখিয়েছেন উপনিবেশিক সংস্কৃতির শিক্ষা অহমিকাতেও। তাই ঔপনিবেশিক শিক্ষায় মানুষ আধুনিক হয়ে উঠেছে, কিন্তু সংস্কারের নির্মোক অন্তর থেকে উপড়ে ফেলতে পারে নি। 'ব্রাহ্মণ্য' গল্পে ভূমিসংস্কারের প্রসঙ্গ উঠে এলেও এ গল্প অন্যমাত্রিক, এ গল্প মানুষের আর এক জটিল জিজ্ঞাসাকে সামনে আনে। মহাদেব, তার ভাই, তার স্ত্রী তথা পরিবার ব্রাহ্মণ সম্পর্কে, জাতি বর্ণ সম্পর্কে যুগ যুগ বাহিত যে সংস্কার বহমান সেই গভীর সংস্কারেই প্রবলভাবে বিশ্বাসী। অন্যদিকে আপাত ভাবে সংস্কার মুক্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নচিকেতা ও কেতকীর অন্তরে সংস্কারের বীজ উপ্ত হয়েছে অন্যভাবে। রাইনগরের দুর্গম গ্রামে কৃপাভিক্ষু শূদ্রকুল আজও অপেক্ষা করে ব্রাহ্মণের জন্য। ব্রাহ্মণ পেলে তাদের আদের শেষ নেই, তাদের পায়ে মাথা ঠুকে, মৃত্যুপথযাত্রিণী খায় পা ধোওয়া জল। যে পানের বোরজে নারীর প্রবেশ নিষেধ তাদের কাছে, সেই পানের বোরজে ব্রাহ্মণ নারী প্রবেশ করতে পারে অনায়াসে। অথচ নচিকেতা বা কেতকী অন্য শিক্ষায় বড় হয়ে উঠেছে। নচিকেতার মত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ জানতই না যে বরিন্দে দুর্গম অঞ্চলের মাহিষ্য, সদগোপ, কৈবর্ত, তন্তুবায়, তামলী, বাই প্রভৃতি সমাজের মানুষগুলি পুণ্যার্জনের আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে একালেও অপেক্ষা করে আছে। আবার

হাঁড়ি, ডোম, ভুঁইমালী, ব্যাধ, চণ্ডাল ইত্যাদি মানুষরা ব্রাহ্মণ দেখতে পায়-ই না। কেননা তারা এখনো ঘোর পাপী। অথচ "গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র মার্কসবাদ ফলাফালা করেছে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। রাইনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সদস্যও। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভত্তি তারও কিছু কম নয়।" উপনিবেশিক শিক্ষার স্পর্শরহিত গ্রামীণ পরিমণ্ডলটিকে যথার্থ দক্ষত ায় চিহ্নিত করার পাশাপাশি গল্পকার নচিকেতা কেতকীর অন্তর্লোকের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। নচিকেতা পৈতে কিনে এনেছে বাজার থেকে। এ ঘটনা তার স্ত্রী মেনে নিতে পারে না। সত্তরের দশকে কলকাতায় কলেজ ষ্ট্রীট পাড়ায় তারা কলেজ জীবন কাটিয়েছে। বিয়েও হয় রেজেষ্ট্রির মাধ্যমে পৈতে যেখানে অবাঞ্ছিত। কেতকী চায় তার ছেলে যথার্থ আধুনিক হোক। কিন্তু নচিকেতাকে আজ কোন ভূত পেয়ে বসল সে তার উপলব্ধি করতে পারে না। এর মাধ্যমেই গল্প অন্য বৃত্তান্তেপৌঁছায়, পৌঁছায়, নচিকেতা কেতকীর বৃত্তান্তে। গোষ্ঠী থেকে পরিবার জীবনের মধ্যে, লোকায়ত দেশজ পরিবেশ থেকে শহরে ন াগরিকনরনারীর জীবনের মধ্যে। নচিকেতা গ্রামীণ মানুষজনের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে চায়, চায় না তাদের অনাবশ্যক আঘ াত দিতে। রাইনগরে পঞ্চায়েত, উন্নয়ন, রাজনৈতিক দলের গ্রাম্য নেতার রক্তচক্ষু টাউট দালাল মস্তানের ষণ্ডামি, সরকারি আমলার অশোভন কর্তৃত্ব--- সবকিছু মেনে এই সব মানুষের সঙ্গেই একবার সুস্থির ভাবে চাকরি বাঁচিয়ে রাখতে চায়। --- "সে শুধু কেতকীকে বোঝাতে চেয়েছিল এই সব মানুষ এত অসহায় যে জাতপাত, ধর্মাধর্ম বিষয়ক নাগরিক মূল্যবোধ এখ ানে অকারণ দুঃখবর্ধক হবে।" অথচ কেতকীর বিষয়টি প্রবঞ্চনার মতো মনে হয়। কেতকী ব্রাহ্মণ নয়, এই কারণে নচিকেত ার মা তার হাতের ছোঁয়া জল খেতে চান নি। নচিকেতার অসবর্ণ বিবাহে আহত হয়ে অল্পকালের মধ্যেই বাবার অকাল মৃত্যু ঘটে। নচিকেতা কেতকীকে বোঝাতে চায় যে তাদের উভয়ের মা বাবার যথাক্রমে ঘৃণা ও ভয় পাওয়ার মধ্যে তদের অন্তরের গভীরে ক্রিয়াশীল জাতের শিকড় তথা সংস্কার। একখানি চিঠি জনৈক সন্তোষ কুমার মিত্র প্রেরণ করলে পিতামাত ার মতো তাদেরও এই জাতি জনিত সংস্কার মনের মধ্যে তোলপাড় করে। সে চিঠিতে অপরিচিত ব্যক্তিটি নিবেদন করেছে যে কেতকীর পিতামহ শশধর ঘোষ আদতে সদগোপ্ বংশোদ্ভব হলেও দেশভাগের কিছু পূর্বে এদেশে এসে বংশপরিচয় গে াপন করে নিজেকে কুলীন কায়স্থ হিসাবে পরিচয় দিতে শু করে। চিঠিতে এই খবর পড়ার পর কেতকী তার বাল্যকাল থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত বাড়ির জাতপাত বিষয়ক যাবতীয় কথাবার্তা, আচার - আচরণ অনুপুঙক্ষভাবে পর্যালোচনা ক'রে দেখে যে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় না। অথচ এতকাল পর্যন্ত নিজেকে উচচ কায়স্থ বংশীয় ভেবে গর্ববোধই করেছে। এইঅহংবে াধ তাকে পীড়িত করে, নিরালায় একাকী ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে সে, অন্যদিকে নচিকেতা অনুভব করে যে কেতকীর কূলশীল বিষয়ক জটিলতা তার মধ্যেও পাকিয়ে দিচ্ছে এক ধরনের জট---"এখন হঠাৎ তার মনে হয় সঙ্গীত, সাহিত্য, ফিল্ম, নাটক, শিষ্টাচার, সংবেদনশীলতা ইত্যাদির পাঠ সে এবং কেতকী কি একই মানের পেয়েছে? টেপরেকর্ডার, টিভির বিষয় থেকে শু করেভল্যুমের মাত্রানির্ধারণ, রবীন্দ্রনাথের গান থেকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে, পরিচারিকার সঙ্গে ব্যবহারে কিংবা দাক্ষিণ্যের অপ্রতুলতায় আচমকা লেনদেনের মধ্যে অবিবেচক সূক্ষ্ম স্বার্থপরতায়, অর্থাৎ চি, ন্যায় নীতি, শিষ্টাচার, সৌজন্য ইত্যাদি শিক্ষিত উচচশিক্ষিত ধারাবাহিক সংস্কৃত মানসিকতার পাঠশালা তার আরকেতকীর কি এক? এতকাল অস্বস্তি লেগেছে, কিন্তু সে নিজে হয়ত একটু বেশি বাতিকগ্রস্ত অথবা বেশি সংবেদনশীল নচিকেতা এরকমএকটা নিষ্পত্তি করেছে নিজের সঙ্গে। কিন্তু গত দশ বারোদিন ধরে এই নতুন অস্বস্তি তাকে গোপনে পীড়া দিচ্ছে।" তার মনে পড়েযায় যে বম্বেতে ট্রেনিংয়ের সময় অনিদ্ধ রায় চৌধুরীর নাম পদবী পরিবর্তনের ফলে অপমানিত হওয়ার দৃশ্যটাকে, কিংবা অকর্মণ্য নেশাখোর পাঁচুর ব্রাহ্মণ্য মনোভাবকে জাহির করার প্রচেষ্টাকে কিংবা গ্রামের অন্যান্য মানুষদের 'চাষা' বলে ঘৃণা করার প্রচেষ্টাকে। এরপর অভিজিৎ ইঙ্গিতে নিহিতার্থে আমাদের যুগ যুগ ধরে অন্তরে প্রোথিত অন্ধকারকে দেখালেন "সিঁড়ির নিচে বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে এসেছে, সেই আবছায়ায় দাঁড়িয়ে সে ক্রমশ বিষণ্ণ হতে থাকে।" নচিকেতার মনে হয় পাঁচু অনিদ্ধ শশধর, সে নিজে, মহাদেব ভৌমিকও তার পরিবার, শশধর ও তার উত্তরাধিকার প্রত্যেকেই এক প্রবল সংস্কারের শিকার।নগরী কলকাতায় আধুনিকতার আলো পাবে এইমনে করেই নচিকেতা ও তার স্ত্রী কেতকী পুত্রকে ছেড়ে বাস করছে। বর্তমানের আবছায়া আঁধারে দাঁড়িয়ে নচিকেতার মনে হয় সে আলো কৃত্রিম, আরোপিত, বাহ্যিক আমাদের মনে াজগতের অন্ধকারকে দূর করতে পারে না। লহমায় নচিকেতা ভবিষ্যৎকে দেখতে চায়, উত্তরাধিকারী জন্য মন হঠাৎ হু হু করে ওঠেয" গঠনের দিক দিয়ে ছোটগল্পটি এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু অভিজিৎ এক ইতিবাচক জগৎকে তাঁর গল্পের পরিণতিতে দেখান। মৃত্যুপথযাত্রিনী মহাদেব ভৌমিকের স্ত্রীর শেষ আকাঙক্ষা কেতকীর উপস্থিতিতে পূর্ণ হয়, মৃত্যুর পূর্বে

কেতকীর পায়ের ধূলো দেওয়া হয় তার মাথায়। সমবেত স্বরে ক্রন্দন করে নারীরা, ময়না পাখিটি জিজ্ঞাসা করে তার মা কোথায় যাচ্ছে, পুষরা ক্রিয়াকর্মে ত্রুটি যেন না হয় এমন ঘোষণা করে। এর মধ্যে দিয়ে কৌম সমাজের সংঘবদ্ধতার দিকটিকেই উপস্থাপিত করেন গল্পকার, দেখান সংস্কারে নিমজ্জিত মানুষগুলি পরস্পরের বিপদে একত্রিত হয়ে কাজও করতে পারে।

এই গল্পের অনুসরণেই পড়া যায় 'কলাপাতা' গল্পটি যেখানে সংস্কারের অন্ধকারের অতলান্ত গভীরতাকে চিহ্নিত করেছেন অভিজিৎ। অভিজিতের অনেক গল্পের মতোই - এ গল্পের 'আমি' ব্যাঙ্ককর্মী, আঞ্চলিক অফিসের অফিসার। এই গল্পেও জমি নিয়ে সংঘাত বা সংঘর্ষের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে ধর্মসংক্রান্ত রক্ষণশীলতার প্রসঙ্গ। অভিজিৎ তাঁর ছোটগল্পে বারবার দেখান যে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা আমাদের মনের অন্ধকার সম্পূর্ণত দূর করতে পারেনি। অভিজিৎ প্রশ্ন তোলেন যে এই সংস্কার আমাদের মনের গভীরে এতই প্রোথিত যে আদৌ তা দূর করা সম্ভব কি না। আমাদের যাবতীয় শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির ধারা সমস্ত কিছুই গড়ে ওঠা উচিৎ ছিল এদেশেরই রীতি পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে। অথচ তা না হওয়ার ফলে আজ আমরা কোন্ অষ্টাবক্র জটিলতায় তমোগাহন ক'রে চলেছি? উত্তরের একটি জেলা শহরে নতুন কালেকটার সাহেবের ধর্ম মুসলমান হওয়ার ফলে জেলাবাসী বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলযে ইতিপূর্বে আগত পুলিশ সাহেব ও জর্জ সাহেবের ধর্মও মুসলমান। আঞ্চলিক অফিসের কর্মচারীদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে তিনি ব্যাখ্যা করেন। কখনো কৌতুকময়তার মধ্য দিয়ে, কখনো নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে, কখনো ভাষ্য সংযোজনের মধ্য দিয়ে ছোটগল্পের কায়া গড়ে তোলেন লেখক। কথকের অভিব্যক্তিতে যে স্বরন্যাস পরিস্ফুট তাতে বাঙালিদের ধর্ম সম্পর্কিত মনোভঙ্গিটি স্পষ্ট। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের অধিবাসীর চেয়ে বাঙালিদের ধর্ম সম্পর্কিত মনোভঙ্গিটি স্পষ্ট। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের আদিবাসীর চেয়ে বাঙালিরা ধর্ম সম্পর্কে অনেক বেশি উদার, তাদের মনোভাবে ইহলৌকিকতার আধিক্য। জেলা কালেকটর সাহেব তথা তৃতীয়জন কাজে যোগ দেওয়ার পরেই বিষয়টি জেলাবাসীর নজরে এসেছে। অন্য প্রদেশ হলে সেখানে প্রথম জন কাজে যোগ দেওয়ার পরই এই ঘটনা ঘটত। এই গল্পের লেখকের প্রবাদ - প্রবচন - সূক্তি লোক সাধারণে প্রচলিত কৌতুক ইত্যাদি সংযোজনের মধ্যে দিয়ে দেশজ পরম্পরাকে গড়ে তোলার সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তাই সমীরের উচচারণে লেখক লোক প্রচলিত রসিকতাকে শোনান "সে বলল হামাকে ঠকাবে। এক ঢোক খেলাম, দু ঢোক খেলাম, তিন ঢোক খেয়ে ঠিক বাতলে দলাম মদ লয়, মুত! হামি মালদার ছেল্লে!" এরপরই লেখক সদর শহরের আঞ্চলিক অফিসের সঙ্গে রাঘবপুর শাখার অফিসের সহকর্মীদের কথাবার্ত্যাকে সংযোজন ক'রে দেখালেন যে, তা মূলত সমপ্রকৃতির। তাই দেখি, আঞ্চলিক অফিসে সমীর ও বীরেন্দ্রের কথাবার্তা আর রাঘুবপুরের অফিসে শিবু ও বাবণেরঅাচরণের তারতম্য বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। রাবণ ও শিব সরকারি নানা প্রকল্পের উপভোক্তাদের মধ্যে মুসলমানদের নানা অছিলায় বঞ্চিত করার পক্ষপাতি। আবার হানিফ মাস্টারের মতো ব্যক্তি আঞ্চলিক অফিসে এসে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য করতে দ্বিধান্বিত হয় না। তাই ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে সংস্কার শিবু ও হানিফ মাস্টারের ক্ষেত্রে তুল্যমূল্য বলেই মনে হয় ব্যাঙ্ককর্মী 'আমি'র। অন্যদিকে এর আগেই দেখা গেছে নতুন জজসাহেবের সহায়তায় মসজিদ সংস্কার হচ্ছে, মসজিদের জমি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হচ্ছে। অফিসে আসতে গিয়ে একটি মুসলমান পরিবারের শিশু শিভুর গায়ে বমি ক'রে দিলে সে ধরে নেয় যে শিশুটি গোর মাংস খেয়েছিল। অচিরেই শিভু শয্যাশায়ী হয়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডেকে এনে মাথা নাড়া ক'রে গোবর খেয়ে শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করে। এক অজানা আতঙ্ক তাকে গ্রাস করে এবং সে মানসিকভাবে ভেঙে প'ড়ে আত্মহত্যা করে। শিবুর মৃত্যুর পরে হানিফ মাস্টার সেই ঘটনার দুঃখ পাওয়ার বিষয়টি স্বীকর ক'রে একথা জানাতে ভোলে না যে নীল আরমস্টং মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

সমসাময়িক যে প্রশ্ন আমাদের জর্জরিত ক'রে চলেছে, যে সংকটকে আমরা প্রতিনিয়ত এড়িয়ে যেতে চাইছি অথচ পারছি না--- সেই সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাই রেখে গেছেন গল্পকার। কেন শিবু আত্মহত্যা করে? কেন হানিফ মাস্টার নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে পড়ে। উনিশ শতকীয় আধুনিকতা দু'শো বছরেও আমাদের সংস্কার - বিশ্বাসকে বদল করতে পেরেছে কি? আমরা একে অপরের পাশে থেকেও আসলে যে কত দূরবর্তী সেই বিষয়টিই গল্পকার দেখিয়েছেন এই গল্পে। তাই জেলায় নিযুক্ত তিনজন অফিসারের ধর্ম মুসলমান হওয়ায় শহরে হৈ চৈ পড়ে যায়, ঠিকাদাররা জেলাটা 'মুসলমান রাজত্ব হয়ে গেছে মনে ক'রে প্রকাশ্যভাবে ক্রুদ্ধ আক্ষেপ প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে না। অযোধ্যা প্রসঙ্গে বামপন্থী

শহরটিতে মুহূর্তে তোলপাড় শু হয়। আবার অন্য অনেক কাজ বাদ দিয়ে প্রথমেই শহরে মসজিদ সংস্কার হয়; রবিউল আস ার সঙ্গে সঙ্গে হানিফ মাস্টার চলে আসে, এমন মনোভাব প্রকাশ করে যে রবিউল তার পূর্ব পরিচিত। গল্পের অন্তিমে লেখক ভাষ্য সংযোজনের মধ্য দিয়ে "আমি জানি না, একজন কৃষক খুন, রাঘবপুরের মিছিল,আঞ্চলিক অফিসে আম াদের খোলামেলা আলোচনা, শিবুর সর্বাঙ্গ বিষাক্ত হয়ে যাওয়া অশুদ্ধতা, ঠিকাদারদের ক্রুদ্ধ স্লোগান, হানিফ মাস্টারের নীল আরমষ্ট্রং বিষয়ক গল্প, এসবের মধ্যে কোনও সাধারণ যোগসূত্র আছে কি না।" এ এক নতুন বয়ান, যা আধুনিকতার বয়ানকে দূরে ঠেলে দেয়। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অন্ধকার নাগাল পায় না আধুনিকতার আলো। তাই "রবিউলের সামনে বসে থাকা লোকটির মুখ আমার অন্যমনস্ক চোখের সামনে বদলে আস্তে আস্তে শিবুর মুখের মত হয়ে যাচ্ছিল।"

এই গল্পের মতো 'লখীন্দ ফিরে আসবে' গল্পেও স্বতন্ত্র এক জগৎ নির্মাণের দ্বারা প্রচলিত বয়ানের বিপরীত বয়ান গড়ে তে ালেন লেখক। আধুনিকতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যুক্তিবোধ। কিন্তু যুক্তি দিয়েও সমগ্র জীবনকে বিচার করা যায় না। পে াস্ট মর্ডান পিরিয়ডে যুক্তিকে ব্যঙ্গ করা হয়। 'লখীন্দর ফিরে আসবে' গল্পে লেখক বাস্তব ও অবাস্তবের কুহকে ঝিাসের জগৎ নির্মাণ করেছেন। আধুনিকতার সঙ্গে আমাদের প্রাচ্য ভাবনার পার্থক্য আছে। আমরা যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ যারা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত তারা সর্বদাই দেশজ পদ্ধতির চিকিৎসা বিদ্যার বিদ্ধাচরণ ক'রে থাকি, অথচ সেই সব কিছুকে মন থেকে দূর করে দিতেও পারি না। 'লখীন্দর ফিরেআসবে' গল্পে অশোকের বক্তব্যের ও আচরণের মধ্যে এই বিষয়টিই ক ার্যকর। শিক্ষক সম্মেলনে মেদিনীপুর যেতে গিয়ে কথক চরিত্রের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দেখা হয় এককালের ঝিবিদ্যালয়ের সহপাঠী অশোক ও অণিমার সঙ্গে। অশোক ও অণিমা বর্তমানে স্বামী স্ত্রী, এসেছে উত্তরবঙ্গে কোনও জেলা সদর থেকে। এমন সময় দেখা যায় বছর তিরিশেক বয়সের এক দম্পতি অশোক ও অণিমাকে যথাক্রমে বাবা ও মা ব'লে সম্বোধন করছে এবং অশোক ও অণিমাও তাদের প্রতি এক অপার বাৎসল্যের টানে কথা ব'লে চলেছে। তারা বিদায় নেওয়ার পর 'আমি' জিজ্ঞাসা করি উক্ত দম্পতির পরিচয় সম্পর্কে এবং এই প্রসঙ্গে আসে কমল সাধুর বৃত্তান্ত। গল্পের মধ্যে গল্পকে নিয়ে এসেছেন অভিজিৎ। অতিপ্রাকৃত আবহে নির্মিত গল্পের একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে আরও একটি বৃত্ত থাকে। বহির্বৃত্তটিতে অতিপ্রাকৃত বাতাবরণ থাকলেও অভ্যন্তরীণ বৃত্তে থাকে মনঃস্তাত্ত্বিক ঝিশ্লেষণ--- গল্পটি হয়ে ওঠে মনোঝিশ্লেষণের গল্প। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি প্রসঙ্গত মনে পড়ে, যেখানে প্লাটফর্মের আবহে একটি গল্প শু হয়েছে আর অন্যটি গড়ে উঠেছে শাহীবাগের রাজপ্রাসাদে। 'লখীন্দর ফিরে আসবে' গল্পেও তাই কথক চরিত্রে পালাবদল ঘটে। অশোক হয়ে যায় অভ্যন্তরীণ বৃত্তের কথক। কমল সাধু এককালে ছিল অশোকের অর্থাৎ 'আমি'-র প্রাণের বন্ধু। পড়া ছাড়ার পর সে হাটে ব্যবসা করত জিনিসপত্র কেনাবেচার। হঠাৎ শহর ছেড়ে চলে গেল এবং তিন চার বছর পর ফিরে এসে গ্রামগঞ্জের ম ানুষকে নানা নিরাময় ও স্বপ্নসম্ভবের ভেষজ বিক্রি করত। 'আমি' এই বিষয়টিকে বুজকি বলেই মনে করত এবং কমলের প্রতিও সে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করত। কমলের শক্তি পরীক্ষার জন্য 'আমি' তার দেহের চুলকানি রোগটি কমলকে দেখায় এবং কমল তাকে চুলকাতে নিষেধ করার টোটকা বলে ও দশদিনের জন্য দশটি বড়ি খেতে দেয়। তিনদিন ঔষধ খাওয়ার পর 'আমি' সেই ঔষধের ইতিবাচক প্রক্রিয়া টের পায়---- "আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে, আমি যে দুজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছিলাম, তারা কেউ ধরতে না পারলেও, কমল বোধহয় ঠিকই ধরেছিল যে কোনও এক ধরণের মানসিক চ াপ, যাকে ইংরাজিতে ডিপ্রেসন বলে, আমাকে শারীরিক বিকারে নিগৃহীত করার রাস্তা খুঁজে নিয়েছে। এতদিন ধরে যেসব ব্যাপারে নিজের কাছেও অস্বীকার করতে চেষ্টা করতাম, কমলের সঙ্গে কথা বলার পর কেমন যেন সব উলঙ্গ হয়ে প্রকাশ পেতে লাগল।" মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পঙ্গু মানসিকতাকে পরিবেশন করলেন গল্পকার, বাহ্যিক শোভনতার অন্তরালে দগদগে ক্ষতকে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টাকে দেখালেন তিনি। তাই দেখি, কমলের ওষুধ ফেরত দেয় আমি অথচ তার টোটকা যথাসম্ভব অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। এই ঘটনার পর হঠাৎ শোনা যায় যে কমল সাধু সর্পদংশনে মৃত এক ব্যক্তির জীবন ফিরিয়ে দেবে। 'আমি' নদীর ধারে কমল সাধুর কীর্তিকলাপ দেখতে যায়। সেখানে দেখে কমল সাধুর কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিকে এবং নদীর পার থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত খুব সুন্দর ক'রে সাজানো একখানি ভেলাকে। মৃত মানুষটির স্বজনদের নির্মিত ভেলা টির গঠনসজ্জা এবং ভেলাটিতে প্রদত্ত গ্রাম্য পটুয়ার হাতে আঁকা ছবি ও পটের অনুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করেন গল্পকার। অ াসলে এর মধ্য দিয়ে দেশজ শিল্প তথা দেশজ প্রক্রিয়ার প্রতি লেখকের বিশেষ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের দিকটি স্পষ্ট হয়। রাতে আমি আবার নদীর তীরে উপস্থিত হলে গায়ক ও বাদকের যুগপৎ সম্মিলনে পরিবেশিত মনসার ভাসান গান শুনতে পায়।

মূল গায়েনের পদ কিছু বুঝতে না পারলেও 'জলে ভাসিল রে ও মোর নয়নের তারা --- ভাসিল রে----" এই ধুয়া পুনঃপুনঃ শোনার ফলে এক সর্বৈব বেদনাবিধুরতা সর্বাঙ্গ স্পর্শ করল তাকে। বাস্তব ও অবাস্তব জগতের সহায়তা এক কুহকী বাস্তবের নির্মাণের মাধ্যমে এক অনৈসর্গিক পরিমণ্ডল রচনা করেছেন গল্পকার। যে 'আমি' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশীদার, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, কমল সাধুর টোটকাকে চাতুরি বলেই মনে করে সেই 'আমি' মুহূর্তের মধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। "জগতের যত হতাশা, কান্না আর ব্যথা, যত হাহাকার, না হওয়া এবং আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক, আধিভৌতিক আর আধিদৈবিক যতসব দুঃখ আর শঙ্কা, জগতের যত অমঙ্গল--- এই সবকিছু থেকে রেহাই পাবার জন্য এই নিসর্গ যেন এক প্র ার্থনা সভার আয়োজন করেছে। ওই যে কজন মানুষ ওখানে বসে আছে নদী এবং গাড়ির সংযোগের অর্ধচন্দ্রে যারা কে ানও মতে চালা তুলে গৃহস্থালী করে আর এই শহরের আর সব মানুষ যারা বিশ্বাস এবং সংশয় সত্ত্বেও উন্মুখ হয়ে আছে, এই নদী পথের গ্রাম নগর, যারা এই কলায় মঞ্জুষের ভিতরে এই বালিকার মুখ মৃত দেখে 'জয় মা বিষহরি'বলে ধবনি তুলেছে, তাদের সবার সঙ্গে আমিও যেন প্রার্থনা করতে লাগলাম, জিয়াও সাধু, তুমি ওকে জিয়াও।" কিছুক্ষণ পর সচেতন হতে 'আমি' লক্ষকরল ইঁদুরের চলে যাওয়াকে, তার মনে হল বিষহরির থান, জল এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠান পরিবৃত অঞ্চলে বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক নয়। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত 'আমি', যুক্তিবাদী 'আমি', বিশ্বাসবাদে আক্রান্ত। পরের দিন 'আমি' লে াকমুখে শোনে যে, কমল সাধু তিনদিন আগে সর্পদংশনে আহত এমন ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনার পর 'আমি' কমল সাধুকে এড়িয়ে চলে, কেননা দৈনন্দিন জীবনবোধ তথা আদর্শের বিষয়ে দু'জনের মধ্যে রয়েছে আশমান - জমিন ব্যবধান। এই ঘটনার মাস চারেক পর এক মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে 'আমি'-র বাড়ি উপস্থিত। ওই মধ্যবয়সী মহিলার দা বি যে 'আমি'-র ছোঁওয়া জল তার পুত্র খাবে, কেননা গত জন্মে তার পুত্রের পিতা ছিল 'আমি' এবং তাকে সে যথেষ্ট অবহেলা করেছে। যুক্তিবাদী 'আমি' তা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। অথচ 'আমি' দেখে যে পিতা একদা চিকিৎসক, অ াজীবন মার্কসবাদী, বাড়ি থেকে বহুপূর্বেই লক্ষ্মীর পাট উঠিয়ে দিয়েছেন, তিনিও পুত্রকে পাদোদক প্রদানের ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেছেন। অবশেষে 'আমি' তা দিতে বাধ্য হয় এবং জেনে নেয় যে কমল সাধুর পরামর্শক্রমে ঐ মহিলা ও তার পুত্র এসেছে। একসময় ডিওডেনাল আলসারে ভোগা এই ছেলেটিই বর্তমানের গোপাল। এইভাবে এক বিশ্বাসের পরিমণ্ডলকে নির্মাণ ক'রে গল্পের অন্তিমে ফিরে আসেন বর্তমানের চলমানতার মধ্যে "চল, আমাদের গাড়ি দিয়েছে। ওই যে ফেস্টুন খুলে দাঁড়িয়েছে কমরেডরা।"

লোকায়ত কৌম সমাজের মধ্যে সংস্কারের অন্ধকার কতখানি গভীর 'জেহাঙ্গী' ছোটগল্পে অভিজিৎ তা দেখিয়েছেন। ত্রিশ - বত্রিশ বছরের সাঁওতাল গৃহবধূ জেহাঙ্গীকে ডাইন সন্দেহে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে তারই ভাশুরের ছেলে রেংটা। রেংটার পরিবারের কতগুলি অস্বাভাবিক তথা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। তাদের বাড়িতে ডাকাতি হলে তারা সর্বস্ব ান্ত হয়, ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে রেংটার বড় ভাই মারা যায়। এর কিছুদিন পর তার বাবা মারা যায়। এদের সকলকেই সে খুব ভালবাসত। কবিরাজ, মাহান বা গুণমানদেরর কথায় রেংটা বিশ্বাস করে যে সাঁওতাল রমণীরা ডাইন হয়, তারশাশুড়ী ডাইন ছিল, যদিও সে ডাইন নয়। জেহাঙ্গীর স্বামী মাট্রিক পাশ, সাঁওতাল সমাজে শিক্ষিত, তবুও সে বিশ্বাস করে যে মানুষ যদি কারো মঙ্গল করতে পারে, তবে তার পক্ষে নিশ্চয়ই অমঙ্গল করাও সম্ভব। সুতরাং তার বিশ্বাস যে একজন সাঁওতাল নারীর পক্ষে ডাইন হওয়া সম্ভব। জেহাঙ্গীর ভাই সুফল মার্ডির কাছে আহত জেহাঙ্গী দৌড়ে গিয়েছিল বঁ াচার জন্য, সে সুফলকে ডাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে আর্ত ও সন্ত্রস্ত হয়, নিপায় হয়ে নিত্তর থাকে এবং অবশেষে বলে "জেহাঙ্গী বড় জেদী মেয়ে, স্যার তবে ডাইন বোধহয় সে নয়।" আহত জেহাঙ্গীকে বারংবার রেংটা টাঙ্গিতে আঘাত করলে কৌম সাঁওতাল সমাজের কেউই বাধা দেয়নি, বাধা দিয়েছিল কেবলমাত্র তার ভাই সুফল আর আমবাগানে বাগ ান ইজারা নেওয়া লোকজন, যারা সাঁওতাল নয়। এই ঘটনার পর জেহাঙ্গী বেঁচে উঠলে এবং চার বছর পর সে ঘটনার বিচার হলে জেহাঙ্গী জানায় যে রেংটা তাকে আঘাত করেনি। সাক্ষী হসটাইল হলে এবং রেংটা ছাড়া পেলে স্বজন ও গ্র ামবাসীরা একত্রিত হয়, একত্রিত হয় জেহাঙ্গী - রেংটা - জলপা প্রত্যেকেই, কেউ রেংটার প্রতি বিরূপ আচরণ করে না। লে াকায়ত কৌম সমাজের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক জগৎকে নির্মাণের দ্বারা লেখক সত্যের এক স্বতন্ত্র জগৎকে উদ্‌ঘাটন করলেন।

আসলে, আমাদের দেশের লোকায়ত সমাজে সংস্কার, অলৌকিকতা, ডাইন, ঝাড়ফুঁক, ফোকসিন, যাদু ইত্যাদি বিষয়গুলি

গভীরভাবে রয়েছে। আগেই বলেছি, লাতিন আমেরিকার লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ কলোম্বিয়ার মতো দেশের বা লাতিন আমেরিকার পৃথিবীর নির্জনতার জগৎটিকে নির্মাণ করেছেন যাদুবাস্তব রীতিতে। বাস্তব ও মায়ার মিশ্রণে, রঙ্গব্যঙ্গময় এক ভঙ্গিমায় গড়ে উঠেছে এক কাল্পনিক অথচ বাস্তব জগৎ। স্বদেশের সমাজ ইতিহাস সংস্কৃতিকে মন্থন ক'রে, প্রান্তিকায়িত সমাজের মৌখিক ধারাকে তার লোককথাকে নিয়ে এক ভিন্ন বয়ান গড়ে তুলেছেন তিনি। অভিজিৎ এদেশের বিচিত্র ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রান্তিক জনসমাজের মধ্যে বহমান সংস্কৃতিকে মন্থন ক'রে, প্রান্তিকায়িত সমাজের মৌখিক ধারাকে তার লোককথাকে নিয়ে এক ভিন্ন বয়ান গড়ে তুলছেন তিনি। অভিজিৎ এদেশের বিচিত্র ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রান্তিক জনসমাজের মধ্যে বহমান সংস্কৃতিকে উপস্থাপিত ক'রে এক কুহকী জগৎ নির্মাণ করেন। তাঁর 'স্ফিংক্স' গল্পেও এই যাদু আর বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটেছে। চণ্ডীমণ্ডপীয় কথনের ভঙ্গিতে গড়ে ওঠা গল্পটিতে সুরঞ্জন 'আমি' ও নির্মলের কাছে বলে গেছে বছর পনেরো আগেকার পুরনো দিনের কর্মজীবন সম্পর্কে। ডুয়ার্স থেকে দূরবর্তী আলতাবাড়িতে ফার্মার্স সার্ভিস সোসাইটির একজিকিউটিভ অফিসার রূপে কাজ করেছিল সুরঞ্জন। ডুয়ার্সের উষ্ণ আনন্দদায়ক পরিবেশ ত্যাগ ক'রে প্রিয়জনের সান্নিধ্য ব্যতিরেকে সেই মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে বাস করতে সে বাধ্য হয়েছিল উপরমহলের বদলির নির্দেশের ফলে। আলতাবাড়ির সমবায় দপ্তরের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নকুলের বাড়িতেই বাস করত সে মাসখানেক সেই মধ্যযুগের গ্রামের নির্বাসনে থাকার পর নকুল সদরের অফিসে কিছু কাজে গেলে সুরঞ্জনকে স্ফিংক্সের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। গ্রীক পুরাণে স্ফিংকস দানবী চরিত্র। তার দেহে আছে পাখা, তার দেহের উপরের অংশ নারীদেহ হলেও নিম্নের অংশ সিংহের। একটি ধাঁধাকে কেন্দ্র ক'রে দানবী স্ফিংক্স থিবসে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। সকালে চারপায়ে, দুপুরে দুপায়ে, বিকালে তিনপায়ে হাঁটে কোন্ প্রাণী --- এই ধাঁধাসে মানুষ দেখতে পেলেই জিজ্ঞেস করত। কোন মানুষই এই ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে পারত না, তার ফলে সে সমস্ত মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করত। ইডিপাস এই ধাঁধার সঠিক উত্তর হিসাবে মানষের কথা বিলে এবং সকাল - দুপুর - বিকালকে যথার্থভাবে স্ফিংক্স অতিশয় ত্রুদ্ধ হয়ে পর্বত থেকে লম্ফ দিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আমাতীকে পৌরাণিক স্ফিংক্সের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত ক'রে সুরঞ্জন জানায় তার অন্তস্থলের ত্রাসের প্রসঙ্গ স্ফিংক্স কি কারো সেক্স ফ্যানটাসি হতে পারে? কে জানে? কিছুদিন আগে আমি বেশ কয়েকবার স্বপ্ন দেখলাম ভিড়ের বাস থেকে জলপাইগুড়ি স্ট্যাণ্ড নেমেছি। একেবারে হাঁফ ছেড়ে পা ঝাড়া দেওয়ার পর আমার কাঁধের অত সাধেৰ শান্তিনিকেতনী ব্যাগের বদলে ঝুলছে একটা নোংরা ব্রেসিয়ার। এর মানে কি আমাতীর আচ্ছন্নতা আমার এখনও কাটেনি।" ফ্রয়েড বলেছিলেন যে আমাদের অস্তিত্বের অতি অল্প স্থান জুড়ে সচেতন জগৎ অবস্থান করে এবং বেশির ভাগ অংশ জুড়ে থাকে অবচেতনের জগৎ । অবচেতনের জগৎটি চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল জগৎ এবং এর মূল হল সেক্স বা যৌনতা। ফ্রয়েড, তাঁর উত্তরসূরী অ্যাডলার ইয়ুং কিংবা 'ত্রব্ধব্তস্তুনন্দ্বব্দ ন্দ ব্ধড়ন্দ্ব ত্নব্দভন্তড়স্পপ্তস্পসন্ধন্ত স্পন্দ্র ব্দন্দ্বপ্র' গ্রন্থের রচয়িতা হ্যাভলক এলিস মানব সম্পর্কিত এক প্রথাবিরোধী তথা অভিনব ধারণা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন দেহের ও মনের এক অপরিসীম দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কথা। 'স্ফিংক্স' গল্পেও নকুলের অনুপস্থিতিতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুরঞ্জনকে মধ্যযুগের গ্রামীণ পরিবেশের আমাতী নামক এক অশিক্ষিত নারীর ভাবনা অস্থির করে, ঘুমের মধ্যে অসম্ভব যৌন কল্পনা শরীরী কুহক তৈরি করে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে । বাস্তবে এক অসম্ভব ঘোরের মধ্যে এবং চরাচরব্যাপী প্রকৃতির উন্মাদনাময় প্রকাশের মধ্যে সুরঞ্জন এবং আমাতী নিকটবর্তী হলে---"আমার ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে, পিঠে নখ ঢুকিয়ে এবং জান্তব আওয়াজ করে আমাতী আমার যাবতীয় ফ্যান্টাসির সীমানা ছানিয়ে আমাকে নিঃশেষ করে ফেলল।" স্ফিংক্স তথা আমাতী সুরঞ্জনকে জানায় যে পেটকাটি বুড়ির পানে প্রার্থনার ফলে এবং দোমাসী যোগেনের মন্ত্রপড়ার ত্রিয়ায় তাদের এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। প্রায় চার মাস ব্যাপী মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে আমাতীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে একদিকে সুরঞ্জনের যেমন যৌন ফ্যান্টাসির পরিণতি সম্পর্কে মনে প্র্ন জাগল, তেমনি শরীরেও জন্ম নিল এক যন্ত্রণাময় উপসর্গ। সেখান থেকে মুত্ত হয়ে সুরঞ্জন আলিপুরদুয়ার শহরে এসে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে কলকাতা যাব স্থির ক'রে বাসের টিকিট কেটেও এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতায় ফিরে এল আলতাবাড়িতেই। আর সেই আচ্ছন্নতায়, ওযুধের প্রভাবে ঘুমের মধ্যে অবচেতনে, স্বপ্নে কিংবা জাগরণে সে স্ফিংক্সকেই দেখতে পেল---- "আর বাসটা একটা মোড় ঘুরতেই হঠাৎ আমার চোখের সামনে কাঞ্চনজঙঘা দেখা যেতে পারে।" সেই সময়ের এক গণহিস্টিরিয়ার সংত্রমণ সুরঞ্জনকে যেন গ্রাস করল; তার পৌষ, তার অহংকার যেন কে অতলান্ত খাদের নীচে পতিত হয়ে গেল। সুরঞ্জন কলকাতায় ফিরে এসেছিল এবং উপলব্ধি করেছিল যে, স্থান কাল পরিবেশের ভিন্নতায় অ

াধুনিক মানুষকে এক লহমায় এই হিস্টিরিয়া গ্রাস করতে পারে। শুধু অবচেতনে নয়, জ্ঞানবুদ্ধি সজাগ থাকলেও তা হতে পারে। এইভাবে লাতিন আমেরিকার লেখকের মতোই বাস্তব এবং কুহকের সমন্বয়ে ভিন্ন এক যাদু বাস্তবতার জগৎ নির্মাণে অভিজিৎ অপরিসীম সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন স্ফিংক্স গল্পে।

'ফাল্গুনী রাতের পালা' গল্পটিতে যৌন জীবনের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে মহিপদ ও নমিতার সম্পর্ককে কেন্দ্র ক'রে। এই গল্পের 'আমি' এবং মহিপদ দুজনেই ব্যাঙ্ককর্মী, সমবায় ব্যাংকের সুপারভাইজার। বাঁশুড়ি গ্রামের গোপাল মণ্ডলের কর্তৃত্বপরায়ণ নির্দেশ ছিল এই যে, মহিপদকে ভুলিয়ে একবার যেন বাঁশুড়ি আনা হয়। কেননা বাঁশুড়িতে আছে মহিপদর বিবাহযোগ্য কন্যা এবং তার বিয়ের জন্য মহিপদর কাছে থেকে হাজার দশেক টাকা জোর ক'রে আদায় করা হবে। মহিপদ যথেচ্ছ যৌনাচারে পারদর্শী এক পুষ। বাঁশুড়িতে পৌঁছে গোপালের যাবতীয় পরিকল্পনা ভণ্ডুল ক'রে দেয় গোপালের ভাগ্নী তথা তার প্রণয়ী নমিতার সাহচর্যে। রাতের গভীরে নমিতা তার কন্যার জন্য মহিপদর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে আসে এবং মহিপদর কাছে আবারও নিজেকে সমর্পণ করে। পুষের যৌনউন্মাদনার এবং নারীর দেহলোলুপতার চিত্রকে অপরূপ নৈপুণ্যের সাহায্যে অঙ্কন করেছেন অভিজিৎ। ব্যাঙ্ককর্মী 'আমি'-র জবানীতে গল্পকারের স্বরন্যাস "আমার এতকালের একটা ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। যৌন আবেগে মেয়েরা তাহলে পুষের থেকেও দুর্বল! অথচ তাদেরই এতকাল বেশী রক্ষণশীল বলে জেনে এসেছি। আর পুষ মানুষ তো খাটিয়া, কলাগাছ, দরমার বেড়া কাউকে ছাড়ে না, নমিতা তো সুন্দরী স্ত্রীলোক।"

এই গল্পের অনুসরণে পড়া যায় 'বদলি জোয়ানের বিবি' গল্পটি। পিতৃমাতৃহীন অনাথ জানকী আশ্রয় পেয়েছিল গুনসা ক্যাম্প, নিহাল নামে সিকিউরিটি ফোর্সের যুবকের কাছে। তিন বছরের উদ্দামতায় তাদের এক কন্যাও জন্মেছিল। বদলির আদেশ এলে নিহাল জানকীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে অচিরেই সে ফিরে এসে জানকীকে নিয়ে যাবে, কিন্তু সে আর আসেনি। তিন মাস অপেক্ষা করার পর জানকী ক্যাম্পের সেই ঘরে ফিরে এসেছিল, এসেছিল নতুন বি এস এফ চিরঞ্জীলালের কাছে। চিরঞ্জীলাল বদলি হওয়ার পরবর্তী পাঁচ বছর নামদেও, সুরা, মানুয়েলের মতো সঙ্গী তার জুটেছিল, সে পরিণত হয়েছিল বদলি জোয়ানের বিবিতে। তারাও চলে গেলে কিছুদিন পর ফিরে আসে চিরঞ্জীলাল এবং দিন কয়েকের জন্য আসে নিহাল। চিরঞ্জীলাল সতর্ক, সে রিটায়ারের আগে ছয় বছর জানকীর সঙ্গেই থাকতে চায় এবং অবশেষে জানকী ও তার মেয়েকে নিয়ে হরিয়ানাতে ফিরে যেতে চায়। এক রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর নিহাল এলে জানকী বোঝে যে পূর্ব রাত্রে চিরঞ্জীলালের সঙ্গে কী অসম্ভব একাকীত্ব সে ভোগ করেছে। চিরঞ্জীলালের শয্যা তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হয়েছে। তবুও নিহালকে প্রত্যক্ষভাবে ঘৃণার কথা সে জানায় এবং নিহাল চলে যাওয়ার পর চিরঞ্জীলালকে সে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তাকে ত্যাগ ক'রে অন্যত্র কোথাও যাবে না। কিন্তু পরদিন দুপুরে একাকী জানকী সতর্ক চিরঞ্জীলালের সাহচর্য ত্যাগ করে উদ্দাম স্বভাবের কপট ও দ্রোধী নিহালের গাড়িতে ওঠে। এইভাবেই অভিজিৎ জানকী নামক নারীর অভ্যন্তরের স্নিগ্ধ অনুভূতিকে অন্তর্হিত ক'রে দিয়েছেন দেহের অপরিসীম উন্মাদনাকর ক্ষুধার সংস্পর্শে। "সব যে জাদুকরের মায়াবী দণ্ড স্পর্শে হওয়া। জ্বলন্ত তরল রক্ত এখন তার ধমণীতে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিটি বিন্দু স্পর্শ এবং সবল বেস্টনের আশ্লেষে একেবারেই নির্লজ্জ ও বেপথু। সব কিছু এই মুহূর্তেই চাই, এমন একটা জানোয়ারী হর্ষ যেন তার স্নায়ুতে, ধমনীতে, সর্বাঙ্গে।"

'পিতৃহত্যাবিষয়ক' গল্পটির নরনারীর আকর্ষণ - বিকর্ষণের বিষয়টি ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। সারাজীবন গ্ন, নিরীহ এবং বিব্রত নীরেন হত্যা করেছে তার পিতাকে এবং সেই অপরাধের বিচারপর্বকে কেন্দ্র ক'রে এই গল্পটি গড়েউঠেছে। নীরেন আদালতে দোষমুক্ত হতে চায় এবং নিছকই দুর্ঘটনায় তার পিতার মৃত্যু ঘটেছে --- একথা সে জানাতে চায়। কিন্তু প্রকৃতসত্যটি প্রকাশ ক'রে দেয় কর্মচারী গোলোক দাস। গল্পের চরিত্র মনোতোষ মুহুরি রাখালের কাছে নীরেনের পিতা যামিনীর হত্যার বিষয়টি সঠিকভাবে জানতে পারে। সেখানেও রয়েছে নারীকে কেন্দ্র ক'রে এক আদিম লড়াইয়ের কাহিনি। ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে নীরেন তার স্ত্রী অলকাকে দীর্ঘ রাত্রি যন্ত্রণাই দিত, তার দেহের অদম্য আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারত না। অন্যদিকে নীরেনের পিতা যামিনী ছিল প্রবল ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং স্ত্রী বিয়োগে এ বিষয়ে অভুক্তও। ফলে অলকার সঙ্গে যামিনীর দৈহিক সম্পর্ক রচিত হতে বিলম্ব হল না, আর এই কারণেই নীরেনের চরম আঘাতে মৃত্যু ঘটল যামিনীর। এ গল্পে অভিজিৎ অরাজকতার লীলাক্ষেত্র অবেচেতনের আদিম আকর্ষণ ও উদ্দামতা বিষয়ে তাঁর স্বরন্য

াস রেখে গেছেন "মানুষ যা জানে তা হল শাস্ত্রের নিষেধ, আইনের নিষেধ। তাতে কি শেষ রক্ষা হয়? মানুষ কি আর কি জানবে না?" এই গল্পে মনোবিকলনতত্ত্বের মননশীল জীবনদৃষ্টি প্রয়োগের ফলে গভীর বাস্তবটি অঙ্কিত হয়েছে --- "মানুষ আদতে শয়তান। জানোয়ারকে যদি বা ট্রেনিং দিয়ে তার প্রকৃতিকে অভ্যাসে গেঁথে দিতে পারেন, মানুষকে কিন্তু তা প ারবেন না। সুযোগ পেলেই মানুষ শিক্ষা, অভ্যাস, নিয়ম সব বেমালুম হয়।

অল্প শিক্ষিত রাখল কণ্ডিশন্ড রিফ্লেক্স্ - এর কোনো অংশের প্রতি যেন সংশয় প্রকাশ করে ফেলল। সম্ভবত সে শাস্ত্রীয় বিধানও জানে। মনোতোষ জানে ফ্রয়েড।"

গল্পকার অভিজিৎ বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় আসেন তিনি পাঁচের দশকের শুতে। অর্থাৎ তিনি দেশত্যাগের প্রত্যক্ষ বলি। অভিজিতের আখ্যানে স্বভাবতই ধরা পড়ে দেশভাগ প্রসঙ্গ, তবে এই প্রসঙ্গটিতে দুই বিবদমান ধর্মের মানুষের পারস্পরিক হিংস্রতার চিহ্নকে তিনি অঙ্কন করেন না, বরং দুই সম্প্রদায়ের অন্তরের আকর্ষণকেই তিনি উপস্থাপিত করেন। এই গল্পগুলিতে একটি কালের অসঙ্গতির প্রতিবেদন নানাভাবে ধরা পড়ে। তাঁর 'কাঁক' গল্পের প্রারম্ভে গল্পকার জানিয়ে দিয়েছেন যে এ গল্প ছেড়ে আসা দেশে চল্লিশ বছর পর পুনরায় পা ফেলার স্মৃতিমেদুর আচ্ছন্নতার গল্প নয় বরং এ গল্প দাশমশায়ের গল্প। কথক 'আমি'র মনে পড়ে যে পাঁচের দশকে সে যখন পড় াশুনার জন্য কলকাতায় থাকত তখন দাসমশায় কয়েকবার তার কাছে আসে।অর্থাৎ তাদের এককালের একান্নবর্তী পরিব ারের ম্যানেজার দাসমশায়ের সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর পর। প্রতীকায়িত ভ াবে গল্পকার দাসমশায়কে উপস্থাপিত করেন এবং দেখান ইতিহাসের ট্র্যাজেডির কণ ও উজ্জ্বল যুগপৎ দিকটিকে। রাষ্ট্র স্থানকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, দুজনকে দু'দিকে সরিয়ে দেওয়ার ইঙ্কন গল্প অন্যদিকে বৈঙ্কি গল্পও বটে। পিঠোপিঠি দুই ভাই 'আমি' আর শঙ্কর ফিরে অ াসে তাদের পূর্বে ফেলে আসা সুন্দর বন্দর শহরটিতে।স্কুল মাস্টার শঙ্করের ভায়রার বাড়িতে রাতটুকু কাটিয়ে দিনের বেল া দেশের চেহারা দেখতে দেখতে দাসমশায়ের কাছে আসে। 'আমি' ও শঙ্কর দাসমশায়ের কাছে এলে দাসমশায় নাকি সকলেই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। 'আমি' দেখে আর এক বৃদ্ধকে, যাকে শঙ্কর মানিকভাই বলে সম্বোধন করছে। শঙ্কর মা নিক ভাইয়ের কাছে তাদের কাকের খবর নেয়। মানিক জানায় এখনও সে ফার্স্ট, তার দখলে রয়েছে সাড়ে তিনশো কাক এবং প্রতিপক্ষের দখলে মাত্র একশো কাক। দাশ মশাই সরোষে প্রতিবাদ করে বলেন যে মানিকের কথা বিশ্বাস না করাই ভ াল অথচ "ওর কাউলাগুলাও নিপিত্ইয়া কাউরা। এই উঠানের চাউল খাইয়া উই উঠানে গিয়া মুসলমানের ভাত খ ায়।" উত্তরে মাণিক জানাল যে কাকগুলো ঠিক দাসমশায়েরই প্রতিরূপ। এদেশে বাস করেও মন পড়ে থাকে ও দেশের জন্য। এইভাবে দেশ সম্পর্কে ধর্ম সম্পর্কে দুই প্রতিনিধি দাস ও মানিক শৈশব সরলতার পরিচয় দেয়, তাদের আপাত বিব াদে ধরা পড়ে পরস্পরের প্রতি অদম্য আকর্ষণের দিকটি। মানিক মিয়াঁও দাসমশায় একই ভিটের দুদিকেবাস করেন। মা নিক মিয়াঁ ও তার স্ত্রী জামিলার পুত্ররা স্ত্রী সন্তান নিয়ে পৃথগন্ন। অকৃতদার দাসমশায় তাদের সংসারের তৃতীয় ব্যক্তি। শঙ্করেরশ্বশুরবাড়ি এদেশে, সুতরাং তাকে এখানে মাঝে মধ্যেই আসতে হয়। সুতরাং এই পরিবেশে সে পূর্বপরিচিত ও মান ানসই। তাই কথক দেখে--- "এই সম্পর্কের বৃত্তে আমার ভাই শঙ্করেরও অবদান আছে। দাসমশায়ের বন্ধু হিসাবে মানিক মিঞাঁ তার পিতৃব্য স্থানীয় আবার তার স্ত্রী জামিলা তার রাঙাদি। কেননা জামিলার ভাই নাসির তার সহপাঠী ছিল।' শঙ্কর মানিক মিয়াঁর নাতি তথা জাহেদ পুত্রর মনসুরের সামনে তার নান্নির, আম্মুর জন্য বর্ডারে অসম্ভব চালাকি করে নিয়ে আসা আশর্চ্য স্নেহের প্রীতির বন্ধুত্বের উপহারগুলি দেয়। এইভাবেই মানুষের পারস্পরিক নিবিড় সহমর্মিতার আশর্চ্য বন্ধনের চিত্র অঙ্কন করেন গল্পকার অভিজিৎ। কিন্তু যখন এই ভালবাসারউষ্ণ রৌদ্রময় আকাশ গোটা পরিবেশে বিরাজম ান---- "তখন নভেম্বরের আকাশে ছাড়া ছাড়া কিন্তু সন্দেহজনক মেঘ কোথা থেকে এখানে জড়ো হতে শু হয়েছে।" গল্পক ার দাদামশায়ের জবানীতেই প্রকাশ করেন তার নিজের দেশের প্রতি টানকে, অন্যদিকে 'তোমাগো হিন্দুস্থান' সম্পর্কে ধ ারণাকে। "হিন্দুরা এককাট্টা হয়ে ধর্মকর্ম করে। এর থেকে অধর্মের আর কি আছে?" অন্যদিকে গল্পকার প্রতীকায়িতভাবে প্রকাশ করেন এই ভালবাসার নিবিড় বন্ধনের মধ্যে 'সন্দেহজনক' প্রতিকূলতার উদ্ভবকে। জাহেদ বর্তমানে এদেশের একটি বিশেষ ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দিয়েছে, যা তার পরিবারের কেউ পছন্দ করে না। জাহেদ আঘাত করেছে এই বা ড়ির শিক্ষা ঐতিহ্যতে। জাহেদ তাই ছাহেদ হতে চায়। শঙ্কর জাহেদের কাছে আচরণ পরিবর্তনের জন্য মর্মান্তিক আবেদন করলে তাকে ব্যর্থ হতে হয়। অন্যদিকে 'আমি' দেখে তার জন্মভূমির রূপকে, লক্ষ্মীছাড়া গ্রামের ময়ুরপুচ্ছধারী শহরের

এবং আদিম বিস্ময়কর প্রকৃতির রূপকে। রাতে মানিক মিয়াঁ চোখে দেখতে পায় না, দাসমশাইয়ের কাশি প্রবল হয়ে ওঠে। রাঙাদি মানিক মিয়াঁকে হাত ধরে বিছানায় এনে বসিয়ে দেয় যন্ত্রণাকাতর দাসমশায়ের বুকে তেল মালিশ করে দেয়। 'আমি' -র তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে শোনে শঙ্কর তাকে হিসাব মেলানোর কথা বলে আর রাঙাদি বলে গৌরদাস আর নিতাই দাসের গল্প--- "নিতাই দাস দুই হাতে খুলি ধর্‌ইয়া চাইয়া আছে। তখন খুলির মুখের ছটা দিয়া "আল্লা আল্লা" আওয়াজ বাইর হইতে আরম্ভ হইল! কি তাজ্জব!" এবং রাঙাদি বলে "দাস মশায়ের ঘরটি গৌরদাসের আর এ ঘরটি নিতাই দাসের।" এবং সে জানায় "বেশিদিন কথা তো নয়, একই গুষ্টির চাইর পাঁইচ পুষ আগের কথা। পাগল তুই, শঙ্করইয়া, দুই অ্যাক্কেরে পাগল। ঘুমা তুই, আমি যাই।" ইতিহাসের নির্মম ও স্পষ্ট সত্যটি রাঙাদি দেখিয়ে দেয় শঙ্করকে। গল্প শেষ হয় সাতচল্লিশের কালধ্বনি থেকে একাত্তরের কালধ্বনিটি শোনানোর মধ্য দিয়ে। জাহেদের পরিবর্তনে শঙ্কর হিসাব মেলাতে পারে না। অথচ এই জাহেদই মাত্র এগারো বছর বয়সে রাইফেল ধরেছিল দেশ উদ্ধারের জন্য। তার মামা নাসির, একটা শহরের সহপাঠী নাসির মারা যায় পাকিস্তানের সেবায়েত সেনাদের গুলিতে, মারা যায় শঙ্করের স্ত্রী রাণির ভাই সুজনও। গল্প হয়ে যায় বয়ান, প্রতিবেদন,! প্রতীকে চিত্রকল্পে প্রবল হয়ে ওঠে লেখকের স্বরন্যাস। "বাতাসের স্বর উচচগ্রামে উঠেছে। তার সঙ্গে বৃষ্টি শু হয়েছে জোরে। হাওরের দিক থেকে অশরীরী কান্নার মতো বাতাস ধেয়ে আসছে। আর তার সঙ্গে ঝড়ের শাখাচ্যুত কোন পাখি "আ-হা-হাহা" করে বুক ফাটা আর্তনাদ করে উঠল। ঝড়ের বড় কোন একটা ঝাপটায় একসঙ্গে অনেকগুলো কাক কাছের কোন গাছের আশ্রয় হারিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ভারী বিপন্ন তাদের কণ্ঠস্বর। তারা দাসমশায়ের কাক, না মানিক ভাইয়ের, এক রাশ হিসাবে প্রশ্ন আমার মগজ জুড়ে বসে বাকি রাতের ঘুমটুকু কেড়ে নিল।" এ আমাদের কালের এক অসঙ্গতির প্রতিবেদন, আমাদের একালের কুশীলবদের যন্ত্রণাদগ্ধ সত্তার রূপ, আমাদের অস্তিত্ব ও আশ্রয়কে খুঁজতে চেয়ে বিপন্ন হওয়ার আখ্যান।

"কাক" গল্পে কথক 'আমি' শোনে জাহেদের পিতৃত্ব বৃত্তান্ত প্রসঙ্গটি আর 'মানুষের পিছন দিক' গল্পে আনন্দ জ্ঞাত হয় তার জন্মবৃত্তান্তের রহস্যটি। 'কাক' গল্পে জাহাদের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়াটি জানতে পারে না মানিক মিয়াঁ কিংবা দাসমশাই। 'মানুষের পিছ দিক' গল্পেও আনন্দের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ মেনে নিতে পারেনি তার মা - বাবা। রাধিকার পুত্র অবনী নিজের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে চায়, পূর্ণ করতে চায় প্রতিজ্ঞা। সেই দৃপ্ত, সুন্দর, অথচ ক্রোধান্বিত যুবকটির প্রতি স্বামীজীর আদেশ "অযোধ্যা মুক্ত করতে তো তোমাকেই যেতে হবে বাবা।" আনন্দ নিজেকে তৈরি করছিল প্রতিবাদের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবে বলে। কিন্তু রাধিকা চায় তার পুত্র অতীত জীবন সম্পর্কে জানুক। "রাধিকা বলেছিল, বুঝলু আনন্দ, মানুষ তার পিঠনটাক্ বেশি জানে না। যদি জানত, তা হলে খাওয়ি, মারামারি বোধহয় অ্যানা কমই করত। ' আসলে, একাত্তরের যুদ্ধের সময়ে পাকিস্থানি সেনারা অপহরণ করে রাধিকার মতো নারীকে। হিন্দুস্থানি মিলিটারি অফিসার আয়ুব খানেদের বাংকার থেকে উদ্ধার করে গর্ভবতী রাধিকাকে। আনন্দ তার মা রাধিকার কাছে জানতে পারে যে "এই চ্যাংড়ার বাপ হইল পঞ্চাশ--- ষাট - সত্তরজন খান মিলিটারির একজনা, আর সেই একজনা যে কে তা আমিও কবার পারবো না।" আনন্দ যেমন পিতৃত্ব প্রসঙ্গ অবহিত হয়ে ভেঙে পড়ে, তেমনি তার মা তাকে জানায় তার অন্তরের কথা --- সমগ্র জীবন অশুচিময় হওয়ার কথা। প্রতীকি বাক্য বিন্যাসে লেখক ব্যক্তিক ক্রন্দনকে দৈশিক ক্রন্দনে রূপান্তরিত করেন "সেই থেকে রাধিকার কাঁদার পালা শু। তার কান্না আর কিছুতেই শেষ হয় না।"

দেশভাগজনিত বিষাদ এবং নিজের দেশের প্রতি অপরিসীম টানের কথা অভিজিৎ ব্যক্ত করেছেন 'হিমঘর' গল্পেও। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল সংরক্ষণ প্রকল্প সম্পর্কে। আলোচকদের মধ্যে প্রধান হলেন কর্নেল আসরফ আমেদ এবং জনার্দন মহামাত্র -- কিন্তু গৌণ ভূমিকায় রয়েছেন আরও দু'জন কর্নেলের স্ত্রী এবং নিশীথ। নিশীথ আর ম্যাডাম একান্তে কথা বলে জানতে পারে যে ম্যাডামের বাড়ি কলকাতা। ম্যাডাম নিশীথকে অনুরোধ করে তাদের পুরনো বাড়ি পার্কসার্কাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই বিষয়টি স্বামীর কাছে গোপন রাখতে সে অনুরোধ করে। আসলে "বলা যায় না অনেক কিছু। আবার কত কিছুইতো স্তব্ধতা দিয়ে পূরণ করে নিতে হয়। একই ভাষা, একই আকৃতি, প্রকৃতিও। একই ভৌগোলিক অবস্থান। তবুও মানুষকে কত বোঝা যে একা বইতে হয়। কে কাকে কতটুকু জানে?" ম্যাডাম তথা বেগম আমেদ কলকাতার পার্ক সার্কাসে তার শিকড় খুঁজে পেতে চায়, খুঁজে পেতে চায় পুরনোদিনের কোন একটি কর্ণবিন্দুকে। কেননা তাহলে যে তার পিতাকে গিয়ে সে কথা জানাতে পারবে। "কিন্তু নিশীথবাবু, আমিতো সেই বাড়িটা

খুঁজে পেলাম না। আমার আব্বা এখনো বেঁচে আছেন। তিনি তো কোলকাতাতেই এখনো তাঁর দেশ মনে করেন। গিয়ে বলতাম। কি ভীষণ দেশদ্রোহী ভাবুন তো।
নিশীথ বলে আমার বাবাও তাই, ম্যাডাম। ফরিদপুরের কোন এক গণ্ডগ্রামে যে আমারও নাড়ি পোঁতা আছে।'' বিচ্ছিন্ন দুটি উৎস সত্তার শিকড়ের সম্পর্কে মত ব্যক্ত করে তাদেরই অনুবর্তকেরা। কিন্তু স্মৃতি, অনুভূতির, উপলব্ধি তথা অন্দর হারিয়ে যায় বিশ্বায়নের দাপটে, বাজারের হাতছানিতে। হাহাকার তাই প্রবল হয়ে ওঠে। গল্পের অন্তিমে লেখক সেই প্রতীক চিত্রটি অঙ্কন করেন ''গাড়ি ডানদিকের রাস্তায় ঘুরে লঘু শব্দ তুলে এগিয়ে যায়। আবার ডানদিকে ঘুরতে দেখা যায় 'পার্ক সার্কাস মার্কেট' লেখা বাজার। সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি হু হু করে কেঁদে ওঠেন।''

অভিজিতের ছোটগল্পের সামগ্রিক আলোচনায় বলা যায় যে, প্রথাগত প্রতিবেদনের বিপরীতে স্বতন্ত্র স্বরকে তাঁর ছোট গল্পে পাওয়া যায়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কালে নানা বিপর্যয় ও জিজ্ঞাসায় বাঙালি যখন জর্জরিত, সেই কালপটভূমিতে লেখকের মনোভূমি গড়ে উঠেছে। এই সময় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, যৌথ পরিবারগুলি যাচ্ছিল ক্রমশ ভেঙে। অর্থনৈতিক ক্লিষ্টতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলনও এই সময়ই পরিলক্ষিত হয়। মধ্যবিত্ত মানুষের মূল্যবোধগুলি পরিবর্তিত হচ্ছিল, সেই ক্রমশ নানা সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছিল। এই সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কালে মানুষকে, সমাজকে ব্যাপকভাবে চিনেছেন। নিজের সম্পর্ক এবং এই কালপর্ব সম্পর্কে অভিজিৎ স্মরণ করতে গিয়ে বলেছেন ''দেশবিভাগের কুঠারঘাত লক্ষ লক্ষ মানুষের মত, আমাদের পরিবারও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। সমস্ত পাঁচের দশক--- আমার স্কুলজীবন। দুরন্ত দারিদ্র্যে পার হয়েছে।'' এবং ''যাকে আমরা সত্তর দশকের আন্দোলন বলি, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল প্রথম থেকেই। চাকরি এবং ঘর ছেড়ে গ্রামে চলে যাই আমি। এই আন্দোলনে পেশাদার হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম আমি প্রায় প্রথম থেকেই।'' ('কেন লিখি কি লিখি', অভিজিৎ সেন, কোরক, শারদীয় ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ)। অভিজিৎ প্রতিকূল নানা পরিস্থিতিতে মানুষের অসহায় জীবনকে দেখেছেন, গ্রামীণ জীবনের প্রতিটি পল অনুপলকে পরখ করেছেন। ব্যাঙ্কের কর্মচারী হিসাবে তিনি অপারেশন বর্গা কর্মসূচীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থেকেছেন এবং এই সমস্যাটির সঙ্গেও অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হয়েছেন। জীবনকে ব্যক্তিকভাবে নয়, রাজনীতি - সমাজনীতি - অর্থনীতির বহুমাত্রিকতাকে জড়িয়ে দেখেছেন তিনি। তাঁর ছোটগল্পগুলি তাই আমাদের উৎসভূমিটিকে চিনিয়ে দেওয়ার বয়ান। এই বয়ান তিনি নির্মাণ করেন প্রথাগত বয়ানের বিপরীতে। এই বয়ানে তাই আধুনিকতাক সম্পর্কে সংশয় ও জিজ্ঞাসা থেকে যায়। যুক্তিসর্বস্বতার দৃঢ় রশিতে আমাদের মনকে আমরা বদ্ধকরতে চাই, অথচ আমাদের চতুর্দিকেই মজুত রয়েছে অসংখ্য সংস্কার বিশ্বাস - লৌকিক - অতিলৌকিকের অসংখ্য উপাদান। এই লৌকিকতা ও অলৌকিকতাকে উপেক্ষা না ক'রে তারই সমন্বয়ে গড়ে তাঁর কথাসাহিত্যের প্রতিবেদন। এদেশের পরতে পরতে সঞ্চিত স্পন্দনকে, মানুষের যথার্থ পরিচয়কে, জাতির প্রকৃত ইতিহাসকে তুলে ধরতে গিয়ে লেখক এদেশেরই ইতিহাস -- কথকতা - পুরাবৃত্তের দ্বারস্থ হন। তাঁর বিচরণের ক্ষেত্র তাই অধিকাংশ সময়েই লোকায়ত সমাজের ধারার মধ্যে, প্রান্তিকায়িত জনজীবনের মধ্যে। তাদের ইতিহাসকে, পরম্পরাকে তথা লুপ্ত কাহিনিকে উদ্ধার করেছেন অভিজিৎ তাঁর ছোটগল্পে ও উপন্যাসে। ব্যক্তিজীবনে ব্যাঙ্কের কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যেমন তাঁর আছে, তেমনি তাঁর ছোটগল্পেও একজন ব্যাঙ্ককর্মী গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পরিচিত, শ্রেণী সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়। উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ পটভূমিটি অভিজিতের গল্পে বারবার আসে। বিশেষতঃ বরিন্দ অঞ্চলের মাটিকে ও সেই মাটিতলারমানুষকে অসাধারণ দক্ষতায় অঙ্কন করেছেন। উত্তরবঙ্গের আনাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, নাগর, কুলিক , মহানন্দা প্রভৃতি নদীবহুল অঞ্চলকেও তার চারপাশের মানুষজনকে তিনি চিনিয়ে দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশের তিস্তা, তোর্সা, মনসা, রায়ডাক কিংবা ব্রহ্মপুত্র নদী পরিবৃত পরিমণ্ডলকে কিংবা সেই পরিমণ্ডলের অংশীদার - মানুষগুলিকে তাদের আচার সংস্কার কৌম বৈশিষ্ট্য সমেত রূপায়িত করেছেন।অভিজিৎ মানুষের সম্পর্ক নিধারণের বিষয়ে ফ্রয়েডের দ্বারা প্রভাবিত। সম্পর্ক নির্ধারণের অন্যতম নিয়ামক শক্তিরূপে দৈহিক ভূমিকাকে বড় ক'রে দেখেছেন। ভোগের সামগ্রীর কাছে প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতির মতো মানবমনের কোমল দিকগুলি হার মানে। বিশ্বায়নের দাপটে, পণ্যের বাজারে পুষ্পিত পেলব মনের --- কোন মূল্য তাই থাকে না। মানুষের নিরন্তর একা হওয়ার কাহিনিকে তিনি পরিবেশ করেন। উত্তর উপনিবেশকালে এক ভিন্ন প্রতিবেদন রচনায় উৎসাহী অভিজিৎ রচনা করলেও পাঠক তার মধ্যে

একটি গল্পকে খুঁজে পায়। ছোটগল্প লিখতে অভিজিৎ ব্যাকরণগত শিল্পসীমানাকে বারবার লঙঘন করেন। তাঁর ছোটগল্পে তাই উপন্যাসের ব্যাপকতা থাকে। তিনি ছোটগল্প শু করেন ভাষ্যরচনার মধ্য দিয়ে, ব্যক্তির কাহিনি হারিয়ে যায় কৌম সমাজের কাহিনিতে, গল্প শেষও করেন স্বরন্যাসের মধ্য দিয়ে ভাষ্য, টীকা বৃত্তান্ত, সংবাদ, কথকথা, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এক নতুন বয়ান নির্মাণ করেন লেখক। এক ইতিবাচক জীবনদর্শনকে ছোটগল্পের অন্তিমে উপহার দেন তিনি। দেশভাগজনিত বিষাদ তাঁর গল্পে রয়েছে। দেশভাগের প্রত্যক্ষত ও পরোক্ষত শিকার মানুষগুলির শিকড়ের প্রতি টানকে তিনি পরিস্ফুট করেন। সব মিলিয়ে উত্তর উপনিবেশকালের মানুষজনের জিজ্ঞাসাকে অভিজিৎ তাঁর ছোটগল্পে বারবার রেখে যান। আমরা কি এ যাবৎ শিক্ষা সংস্কৃতিকেই লালন করলাম! গল্পকার অভিজিৎ তাঁর ছোটগল্পে এই জিজ্ঞাসাকেই রাখেন এবং উত্তরও খোঁজেন আর এর মাঝেই পাঠক পায় তার প্রকৃত পরিচয়। স্বকীয় দেশ - জাতি - মানুষের যথার্থ পরিচয় পেয়ে সে ইউরোপীয়দের মতো হতাশ হয় না, বরং আনন্দে মুগ্ধ হয়ে যায়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com